রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

বঙ্গ-মহিলা।

পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৪

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীটে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে এবং ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে আর নাদনঘাটের পোষ্টাফিস হইয়া দীর্ঘপাড়ায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বঙ্গ-মহিলা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত।

মূল্য——॥৶০ ডাক মাসুল ৴১০।

এই পুস্তক কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে এবং বি বাঁড়ুয্যের দোকানে পাওয়া যায়।

বঙ্গ-মহিলা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের এবং দুই চারি জন প্রসিদ্ধ লেখকের মত।

"স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের পাঠ্যপুস্তক, বঙ্গ-মহিলার বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সাধারণীতে যে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার অধিকাংশই যোগেন্দ্র বাবুর লেখা—তিনি তাঁহার লেখা প্রবন্ধগুলি এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকের পাঠের উপযুক্ত এ শ্রেণীর এমন আর একখানি গদ্য গ্রন্থ আমাদের ভাষায় নাই। যাঁহারা বনিতা, কন্যা, ভগিনী বা কোন আত্মীয়াকে বোধোদয়, চরিতাবলি প্রভৃতি পড়াইয়া গদ্য কোন্ গ্রন্থ পড়াইবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না, তাঁহারা বঙ্গ-মহিলা একখণ্ড ক্রয় করিয়া তাঁহাদের হস্তে দিলে আমাদের এই অনুরোধ রক্ষার জন্য বোধ হয় অনুতাপ করিবেন না।" সাধারণী——আষাঢ়, ১২৮৮।

"স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের পাঠ্য কি, বঙ্গ-মহিলার শিক্ষা, তিনি কিরূপে পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহার উপন্যাস ও নাটক পাঠ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা, তাঁহার পত্র লিখিবার ধারা, কিরূপে তাঁহার সময় কাটান উচিত, তাঁহার পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত, বঙ্গীয় বিধবার কথা, সধবার কথা, গৃহিণীর কথা, সন্তানাদি পালন, সংসার যাত্রা, আচার, অনাচার, ধর্ম্ম, অলঙ্কার প্রিয়তা, কলহ ও পরনিন্দা, মুখরতা, সেকালের ও একালের বঙ্গ-মহিলার এসব বিষয়-গুলিই যোগেন্দ্র বাবু বিশদ রূপে অল্প কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থ খানি বঙ্গ-মহিলা মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য; অনেক যুবকেরও ইহাতে জ্ঞান যোগ হইবে। পুস্তকের ভাষাটি পরিপাটী, মধ্যে মধ্যে যে একটু আধটু দোষ আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। রাশি রাশি নাটক নবেল অপেক্ষা এরূপ এক-খানি ক্ষুদ্র পুস্তকও ওজনে ভারী। যোগেন্দ্র বাবু বঙ্গ-সমাজের একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন।" নববিভাকর—২৮ ভাদ্র, ১২৮৮।

"বঙ্গ-মহিলায় এইরূপ রহস্য কিম্বা রসোদ্গার নাই। উহার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই ভাবিয়া চিন্তিয়া ও অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লেখা হইয়াছে, এবং

প্রত্যেক প্রবন্ধই গ্রন্থকারের বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। আজি কালিকার অর্দ্ধ শিক্ষিতা অথচ শিক্ষাভিমানিনী বঙ্গীয় কুলমহিলাদিগের সুশিক্ষার জন্য ইহা অপেক্ষা সরল সুখপাঠ্য ও সুনীতিমূলক পুস্তক আর একখানি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।” বান্ধব—পৌষ ১২৮৮।

“পুস্তক খানি ৯৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই পুস্তকখানি আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকের ভাষা অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল অথচ ভাব পূর্ণ। অধুনা নব্য বঙ্গ-মহিলাদের আচার ব্যবহার ও রুচির যেরূপ দিন দিন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অধোগতি দেখা যায়। এই পুস্তকে বঙ্গ-মহিলাদের কোন্ কোন্ কার্য্য গর্হিত এবং কোন্ কোন্ কার্য্য শ্রেয়ঃ, তাহা উত্তম রূপে দেখান হইয়াছে। পুস্তক খানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, কি পুস্তক কি প্রকারে পাঠ করিতে হয়, কিরূপে সময়ের ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, ইত্যাদি কয়েকটি অতিশয় উপাদেয় সারগর্ভ উপদেশ পরিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। স্বামী-বশীকরণ-মন্ত্র শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই গ্রন্থকর্ত্তা যে নব্য বঙ্গ যুবক যুবতীর চরিত্র বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ডে গৃহিণীগণের গৃহ কার্য্য, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। ইহার সকল গুলিই আমাদের মতে এক একবার স্থির চিত্তে পাঠ করা আবশ্যক। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, বঙ্গ-মহিলারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে এবং ইহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারিলে, তাঁহাদের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গ-সমাজেরও যে বিশেষ হিতসাধন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা পুস্তকখানি বঙ্গ-মহিলাগণকে একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এইরূপ পুস্তকের একটি বিশেষ অভাব ছিল, গ্রন্থকর্ত্তা সেই অভাব পূরণ করিতে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।” বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী,—৫ই শ্রাবণ।

“উপদেশগুলি মহার্থ পূর্ণ। বিদ্যার্থিনী বঙ্গ মহিলা মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।” এডুকেশন গেজেট—১৫ই শ্রাবণ।

“এতদ্দেশে আজি কালি সভ্যতার যেরূপ প্রবল স্রোত বহিতেছে, তাহাতে আপনার “বঙ্গ-মহিলা” উপযুক্তরূপে প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় কুলকামিনীর কত উপকারে আসিবে বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই প্রচার উদ্দেশেই আমরা ৫০ খানি বই আনাইয়াছি। এবং এই বইগুলি এতদ্দেশের প্রধান প্রধান বালিকা বিদ্যালয় ও যুবতী বিদ্যালয়ে বিতরণ করিব, এইরূপ মনন করিয়াছি।” জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনা সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের পত্রাংশ—

ভূমিকা।

এই পুস্তকের লিখিত প্রবন্ধগুলি ক্রমে ক্রমে সাধারণী নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল। প্রবন্ধগুলি সাধারণত তরুণবয়স্কা বঙ্গ-মহিলাদিগের জন্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা পুরুষদিগেরও অপাঠ্য না হইতে পারে।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল, সাধারণী সম্পাদক মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধগুলি সংশোধনান্তে তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ কালে বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক পুনঃ সংশোধন করিয়া দিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত ও তাঁহার দ্বারা সংশোধিত না হইলে প্রবন্ধ কয়েকটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সুশিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাদিগের হস্তে এই পুস্তক সাদরে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম; তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

দ্বিতীয় বারের ভূমিকা।

সাহিত্য সমাজে, সুশিক্ষা প্রাপ্ত যুবক যুবতীর নিকট, বঙ্গ-মহিলা যে রূপ আদর লাভ করিয়াছে, তাহা আশাতিরিক্ত। কিন্তু এই পুস্তকের যেরূপ আদর হইয়াছে, ইহার কাট্‌তি তেমন হয় নাই। তবে এই বঙ্গদেশে দুই বৎসরে এক খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া গ্রন্থকারের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। ইহাই ভাবিয়া আমরা বঙ্গ-মহিলা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিলাম—আশা করি, শীঘ্রই আমাদিগকে তৃতীয় বার মুদ্রিত করিবার আয়োজন করিতে হইবে।

এবার পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় এবং পুস্তক খানি উত্তম কাগজে মুদ্রিত করায় ইহার কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করা গেল।

দীর্ঘপাড়া,
চৈত্র, ১২৯০ সাল।

গ্রন্থকার।

বঙ্গমহিলা।

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীলোকে স্বামীর বশ না হইলে এবং রীতিমত শিক্ষা না পাইলে যে, নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় আজি কালি আমাদের দেশের অনেকে স্বীকার করেন। স্ত্রী অবাধ্য হইলে স্বামীকে যাবজ্জীবনের জন্য কষ্ট পাইতে হয়, সংসারে বিন্দুমাত্র সুখ থাকে না, ইহা প্রায় সকলেই জানেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহাতে এই অনর্থ ঘটিতে না পারে, তৎপক্ষে অতি অল্প লোকেই যত্নবান্। আপন আপন স্ত্রী রীতিমত শিক্ষিতা হন, ইহা অনেকেরই ইচ্ছা, কিন্তু কি করিলে যে, তিনি শিক্ষিতা হইবেন, তাহা অনেকে ভাবেন না। আমরা কেবল বিদ্যাশিক্ষাকে রীতিমত শিক্ষা বলি না, আমাদের মতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত নীতিশিক্ষা চাই। কিরূপে স্বামীর সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে অন্যান্য পৌর-জনের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সংসার চালাইতে হয়, এ সমস্তই শিক্ষা দেওয়া উচিত—কয় জনে এরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন?

আজি কালি আমাদের দেশে যখন বিবাহ হয়, তখন

পাত্র স্কুলের বা কলেজের ছাত্র, বয়ঃক্রম বড় জোর বিশ বৎসর। ইংরাজি শিক্ষার গুণে পাত্রের তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে; সিড্‌নি স্মিথ্ প্রভৃতি ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ মনে জাজ্বল্যমান থাকে; সুতরাং বিবাহের পরই স্ত্রী কত দূর শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা একবার জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে হয় তো বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের নাম শুনিতে পান। যাঁহার বড় ভাগ্য তিনি সীতার বনবাসের নাম শুনেন, কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র। তার পর হাতের লেখার অনুসন্ধান করা হয়, হাতের লেখা কিরূপ থাকে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন —লেখা বাহুল্য মাত্র। হাতের লেখা দেখা শেষ হইলে স্বামী মহাশয় ভাবেন, "তবে আর কি পত্র লেখা চলিবে।" পরে দুই জনে ছাড়াছাড়ি হইলে পত্র লেখা চলিতে থাকে; কিন্তু তাহাতে সারগর্ভ কথা খুব অল্পই থাকে, উপদেশ খুব অল্প লোকেই দিয়া থাকেন, কেবল অনাবশ্যক বাক্যে পত্র পূর্ণ করা হয়। পুনর্ব্বার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন স্ত্রীর যৌবন আরম্ভ হইয়াছে, তখন লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক বোধে তাস খেলার আন্দোলনই বেশী হয়। এইরূপে হাসিতে খেলিতে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। তার পরে সন্তানাদি হইলে তখন আর লেখা পড়ার আলোচনা করা ভাল দেখায় না, কাজেই অনেক মহিলার দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যার সীমা হয়। তবে, অনেকে দুই চারি খানি নাটক বা নবেলের যে যে স্থানে স্বাভাবিক বর্ণনা বা কোন উপদেশ থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে যে স্থানে কেবল রহস্যজনক লেখা

থাকে, সেই সেই স্থান পাঠ করিয়া অতি অল্প দিন মধ্যে যে ভয়ানক বিদ্যাবতী হইয়া পড়েন, ইহা আমরা কোনমতে অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের মতে ওরূপ বিদ্যাবতী না হইলেও চলে। স্ত্রীকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য একটু বিস্তারে বলিতেছি।

সচরাচর আমাদের দেশে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বালিকাদিগের বিবাহ হয়, এই সময় শিক্ষার সময়, সুতরাং এই সময়ে স্বামীদিগের অন্যান্য সমুদায় আমোদ প্রমোদ বিস্মৃত হইয়া কেবল স্ত্রীকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শিক্ষার জন্য একটু কঠোর ব্যবহার করাও উচিত। এরূপ করিলে যে, প্রণয়ের লাঘব হয়, ইহা বোধ হয় না। পিতা পুত্রের সহিত কিছু দিন পর্য্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার স্নেহ হ্রাস হয়? না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? তবে, আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, স্ত্রী দোষ করিলেই তাঁহার গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিতে হইবে কিম্বা তাঁহাকে সর্ব্বদা তিরস্কার করিতে হইবে। আমাদের মতে স্ত্রীর কোন প্রকার দোষ দেখিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ দেখাইয়া দেওয়া উচিত এবং যাহাতে ওরূপ দোষ আর না হয় তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। অভিমান করিবে, কি বিরক্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলে না। কেননা ক্ষান্ত থাকিলে স্ত্রী স্বামীকে মনে মনে একটুও ভয় করেন না, কোন দোষ করিতে সঙ্কুচিত হন না, এমন কি পরিশেষে স্বামীকে গ্রাহ্যও করেন না। এ কেবল আমাদের দোষে হয়।

আমরা, স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানি না অথবা জানিয়াও জানি না—সচরাচর দশম বা একাদশ-বর্ষীয়া স্ত্রীকে আমরা ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী জ্ঞানে সেইরূপ ব্যবহার তাঁহার সহিত করিয়া থাকি। প্রথমেই তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি, এবং সেই দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা কর্ত্তৃক সকল বিষয়ে পরিচালিত হই—এইটিই আমাদের মহৎ দোষ। অল্প দিন মধ্যেই সেই বালিকা আমাদের সংসার-সমুদ্রের কর্ণধার হইয়া পড়েন, তখন তিনি যে দিকে চালান, সেই দিকে চলি। কিন্তু যেরূপ আনাড়ী মাঝির হস্তে পড়িয়া অনেককে মধ্য গঙ্গায় হাবুডুবু খাইতে হয়, সেইরূপ আমাদিগকেও মধ্যে মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হয়। তথাপি আমরা তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হই, কেন বলিতে পারি না।

বাল্যকাল হইতে স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া স্বামীকে যে মান্য করিতে হয়, ইহা স্ত্রী প্রথমে জানিতে পারেন না; যখন পারেন তখন আর মান্য করিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং আমরা আপনার মান আপনার দোষে হারাই।

বিবাহের পর স্বামীর কর্ত্তব্য, তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, স্বামী কেবল রহস্যের পাত্র নহেন, তাঁহাকে মান্য করিতে হয়। স্বামীর বিবাহের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীর সকল কার্য্যে দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহাতে বালিকাকাল হইতে তাঁহার শরীরে কোন দোষ না জন্মে, যাহাতে তিনি শান্ত-স্বভাবা হন, প্রথম হইতে এ বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে শেষে মনস্তাপ পাইতে হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, অনেক

স্বামী প্রথমে স্ত্রীকে সুশিক্ষা দান না করিয়া শেষে অনুতাপ করেন। কিছু কাল পর্য্যন্ত স্বামীকে শিক্ষকের ন্যায় কখন গম্ভীর হইতে হইবে, কখন হাস্য করিতে হইবে, সৎকার্য্যের জন্য অল্প সুখ্যাতি ও মন্দ কার্য্যের জন্য মৃদু তিরস্কার করিতে হইবে। এরূপ করিলে স্ত্রী তাঁহাকে একটু মনে মনে ভয় করিবেন এবং তাঁহার বিনানুমতিতে কোন কার্য্য করিবেন না। 'স্বামীকে ভয় করিতে হইবে' পড়িয়া অনেক পাঠিকা হয় তো হাসিয়া অজ্ঞান হইবেন। কিন্তু হাসুন আর যাই করুন, স্বামীকে একটু ভয় করা আমরা স্ত্রীর পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি। যাহাকে লোকে সমিহ বলে, সেই সমিহ একটু থাকা চাই। যেখানে মান্য সেই খানে সমিহ, আর যেখানে সমিহ সেই খানে একটু ভয় থাকে। সমিহ না থাকিলে মান্য করা হয় না, আর ভয় না থাকিলে সমিহ হয় না। অতএব যদি স্বামীকে মান্য করা উচিত হয়, তবে তাঁহাকে একটু ভয় করাও আবশ্যক। এই ভয়টুকু বড় উপকারী।

উপাখ্যানের নায়িকার ন্যায় স্ত্রীলোকে এক্ষণে আমাদের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। যাঁহারা স্ত্রীদিগকে উপাখ্যানের নায়িকার ন্যায় করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই লাভ হয় যে, তাঁহাদের স্ত্রীরা তাঁহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় কার্য্য করেন, কিন্তু, উপাখ্যানের নায়িকার যে সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ষোল অংশের এক অংশও তাঁহাদের থাকে না।

আজি কালি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই গুলিতে খুব অল্প স্ত্রীলোকেই শিক্ষিতা হন। সমস্ত বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন, বঙ্গদেশে এত বিদ্যালয় নাই, সুতরাং অধিকাংশ স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাঁহাদের স্বামীর হস্তে;—স্বামীরা মনোযোগ করিলে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন, না করিলে পারেন না। এজন্য সকলের কর্ত্তব্য যে, আপন আপন স্ত্রীকে প্রত্যহ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া। দিনের মধ্যে অন্তত দুই ঘণ্টাও এই কার্য্যে অতিবাহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেবল দুই এক খানি পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা দিলেই হইল না। তাহাতে মানসিক উন্নতি হয় না, বরং অল্প-শিক্ষা-জনিত দোষ সকল ঘটিতে পারে এবং অনেক সময় ঘটিয়াও থাকে। ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু কেবল জানিলে ফল কি? দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা সময় পান না এমন লোক খুব কম আছেন, সেই দুই ঘণ্টায় তাঁহারা অনায়াসে সারগর্ভ পুস্তক সকল শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তত কষ্ট কে স্বীকার করিবে? পড়াইতে গেলেই নিজে পড়িতে হয়, অত গোলযোগে কে যায়? ততক্ষণ বার্চ সাহেবের দাড়ির বর্ণনায় বা দুই বাজি পাশা খেলিলে অনেক আমোদ লাভ হইতে পারে। যাঁহাদের অন্যের সহিত আমোদ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তাঁহারা স্ত্রীর সহিতই তাস খেলিয়া বা বাজে কথা কহিয়া, কোন রূপে সময় অতিবাহিত করেন। ইঁহারা নিজে হয় তো বিদ্বান্, কিন্তু স্ত্রীদিগকে বিদুষী করিতে অত্যন্ত অযত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দুই

একখানি ভাল পুস্তক কিনিয়া দিয়া মনে করেন, তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল। কিন্তু একটি সুপক্ব বিল্বফল কাকের সম্মুখে রাখিলে সে যেরূপ তাহার রসাস্বাদন করিতে পারেনা, সেইরূপ একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার হস্তে কাদম্বরী বা সীতার বনবাস দিলে তিনি তাহার রসাস্বাদনে অধিকারিণী হন না। যদি কেবল পুস্তক কিনিয়া দিলেই বিদ্যা হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে মূর্খ থাকিত না। ক্রমাগত তিন চারি বৎসর—বরং বেশী—পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা দিলে তবে বিদ্যা শিক্ষায় আনুরক্তি জন্মিতে পারে, একবার অনুরাগ জন্মিলে আর কোন চিন্তা নাই।

স্ত্রীকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে হইলে আমাদের মতে সংবাদ পত্র পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সংবাদ পত্রে বিবিধ বিষয়ের বিবিধ প্রকার প্রবন্ধ ও দেশ বিদেশের নূতন নূতন সংবাদ পাঠ করিয়া অনেকটা মনের প্রশস্ততা জন্মে এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণের ফল ঘরে বসিয়া উপভোগ করিতে পারা যায় সুতরাং ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় উপকারী।

যাঁহারা বহুকাল বিদেশে থাকেন, যাঁহাদের স্ত্রীর সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, পত্রই তাঁহাদের অবলম্বন। পত্র দ্বারা অনেক শিক্ষা দিতে পারা যায়। সকল বিষয়ই পত্রে লিখিতে পারা যায়। পত্রে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ যিনি যে প্রকারেই পারেন আপন আপন স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বঙ্গ-মহিলার বিদ্যাশিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-মহিলার লেখা পড়া শিক্ষা, যে টুকু হয় তাহাও ভাল হয় না। সাধারণত আজি কালি মহিলারা কাব্য নাটক ও উপাখ্যান পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত কয়েক প্রকারের পুস্তক ভিন্ন আরও যে পাঠ্য পুস্তক আছে, তাহা অনেকে জানেন না, আর তাহার কতগুলি পড়া আবশ্যক তাহাও বুঝেন না।

কতগুলি ইতিহাস পাঠ না করিলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; বিশেষত সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইতিহাস পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেক রমণী পদ্মিনীর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু পদ্মিনী যে কোন্ দেশের স্ত্রীলোক, তাহা জানেন না। পৃথ্বীরাজ মহিষীর স্বপ্নের কথা মনে করিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ—মনুষ্য কি দেবতা, কি কিন্নর, কি গন্ধর্ব্ব—কিছুই অবগত নহেন। ক্ষত্রিয়েরা কোন্ দেশের লোক তাঁহারা ভাবিয়া পান না,—ইতিহাস এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেয়। ইতিহাস পাঠ করিয়া কত সাধু পুরুষের ও সাধ্বীসতী, পতিব্রতা, রমণীর বিবরণ অবগত হইয়া মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। যৎকালে যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছিল, তৎকালে হিন্দু রমণীরা মস্তকের কেশ ছেদন করত ধনুকের গুণ করিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা পাঠ করিয়া কি প্রত্যেক রমণীর মনে আনন্দ হয় না? সহস্র প্রকার নীতি ইতিহাস পাঠে শিক্ষা হইয়া থাকে। আমাদিগের মহিলা

দিগের ইতিহাস পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য—অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাস খানি তাঁহাদিগের অভ্যস্ত থাকা চাই। তাহা না থাকিলে তাঁহারা যতই কেন কবিতা পাঠ করুন না, তাঁহাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা কদাচ স্বীকার করিব না।

মহিলাদিগের ভূগোল পাঠ করা বিধেয়। তবে উত্তর আমেরিকায় কয়েকটি দেশ আছে এবং তথাকার অধিবাসীরা কোন্ কোন্ সময়ে আহার করে ইত্যাদি বিষয় না জানিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে এবং পৃথিবীর আকার কি প্রকার, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরগুলি কোথায়, ভারতবর্ষে কয়টি জাতি আছে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, ইহা না জানা অনুচিত—অর্থাৎ অন্যান্য দেশের মোটামুটি বিবরণ ও ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ আমাদের মহিলাদের জ্ঞাতব্য। দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত নাটকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম, অথচ কাছাড় বা মণিপুর কোথায় জানিলাম না, ইহা কি লজ্জার কথা নহে? আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি, দেশের অবস্থা কিছু জানা না থাকিলে কোন সাহিত্য পুস্তক পাঠে তৃপ্তিলাভ হয় না, অনেক স্থানে সন্দেহ থাকিয়া যায় এবং পুস্তকের কোন কোন স্থান হয় ত একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। তাই আমাদিগের অনুরোধ, আমাদের রমণীরা ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণ খানি উত্তমরূপে ও অন্য দেশের বিবরণ মোটামুটি শিক্ষা করিবেন।

ইতিহাস ভূগোল ভিন্ন আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয়

আছে—অঙ্কশাস্ত্রের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু সমুদায় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বলিতেছি না, যাহা সুসাধ্য নহে তাহা করিতে আমরা পরামর্শ দিই না, যেহেতু আমরা জানি সেরূপ পরামর্শের ফল কিছুই হয় না। আমাদিগের মহিলাদিগকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, পরিমিতি প্রভৃতি শিক্ষা করিতে বলার ফল উপহাসাস্পদ হওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে যদি কেহ এই সকল বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আজি কালি যে সকল মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ দরের গণিত বিজ্ঞান পাঠ করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত যে অনুকরণীয় নহে ইহাও বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। তবে সাধারণতঃ যাহা আমাদিগের দৈনিক প্রয়োজনীয় অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে অগ্রে তাহাই শিক্ষা করিতে বলি—আমরা তাঁহাদিগকে সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণ ও ভাগ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিই। এই চারিটি বিষয় শিক্ষা করা অতি আবশ্যক। ধারাপাত খানিও কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, তাহা হইলে আর দেড় পয়সা লিখিতে হইলে কেহ ৫২॥ লিখিবেন না, এবং তিন পাঁচে কত হয় জিজ্ঞাসা করিলে শুষ্কমুখী হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিবেন না। অনেকের উদর হয়ত চারুপাঠ ও সীতার বনবাসের শব্দে ও ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু দেড় আনা করিয়া সের হইলে চারি সের মৎস্যের মূল্য কত, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত "বাবুকে" বহির্ব্বাটী হইতে ডাকাইয়া আনিতে হয়—ইহা অতিশয় লজ্জার কথা।

উপরে আমরা যে তিনটি বিষয় মহিলাদিগকে শিক্ষা করিতে বলিলাম, তিনটি বিষয়ই অতি কঠিন; ইহাতে নাটকের রহস্য, কবিতার মাধুর্য্য বা উপাখ্যানের কৌতূহল উদ্দীপন ক্ষমতা নাই। ইহার অনেক স্থান নীরস। কিছু ধৈর্য্য না থাকিলে আর এ তিন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু একবার যদি পাঠে আসক্তি জন্মে তবে আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। প্রথমে অতি অল্প সময় পাঠ করিতে হয়—দিনের মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলেই যথেষ্ট। ক্রমে পাঠের সময় বৃদ্ধি করিতে হয়, এরূপ না করিলে মন স্থির হওয়া দুরূহ। অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান উপায় গার্হস্থ্য সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা। ইহাতে সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণ, ভাগ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। এই কয়েকটি শিক্ষা না করিলে রীতিমত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে পারা যায় না। ফলতঃ যে উপায়েই হউক শিক্ষা হইলেই হইল। মহিলারা যদি অন্য কোন সহজ উপায় দেখিতে পান, তবে তাহাই অবলম্বন করিবেন। আমরা যাহা বলিতেছি তাহাই যে এক মাত্র উপায় অন্য উপায় নাই একথা আমরা বলি না—বলিলেই বা বিশ্বাস কে করিবে?

স্ত্রীলোকের পাঠ্য পুস্তক।

পূর্ব্বকালে যখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না, তখন রামায়ণ মহাভারতই স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এবং কেহ কেহ দুই একখানি পাঁচালি বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেন। তখন অতি অল্প স্ত্রীলোকেই লেখা পড়া জানিতেন। কালক্রমে ইংরাজি সভ্যতার সহিত স্ত্রীশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইলে, লীলাবতী ও নবীন তপস্বিনী বঙ্গ যুবতীর গৃহ শোভা করিতে লাগিলেন, ক্রমে বিরাম-দায়িনী, সজ্জনরঞ্জিনী, তিলোত্তমা, নিরুপমা, বিলাসবতীতে লোকের গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধ কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের অনাদর হইতে লাগিল। নীল, পীত ও হরিৎ বর্ণের পুস্তক ও পুস্তিকার পরিষ্কার কাগজের পরিষ্কার অক্ষরের নিকট বটতলার কদর্য্য কাগজ ও কদর্য্য অক্ষর তিষ্ঠিতে পারিল না। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস বৃদ্ধা ঠাকুরুণদিদির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে লোকে ভক্তি পূর্ব্বক রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিতেন, এক্ষণে নূতন সভ্যতার অনুরোধে ভক্তি হ্রাস হইয়া গেল। আজি কালি এই দুই পুস্তকের বড় অনাদর হইয়াছে, অন্নদামঙ্গলেরও আর তাদৃশ আদর নাই; পুরুষের কথা দূরে থাকুক কোন স্ত্রীলোকেও আর মহাভারত বা রামায়ণ পাঠ করেন না। যে

রামায়ণ মহাভারত বেদের ন্যায় পূজ্য ছিল, তৎপ্রতি অনাদর—উন্নতি কি অবনতির চিহ্ন বলিতে পারি না।

কোন দেশের কোন জাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সেই জাতির কাব্য পাঠ ব্যতীত ভাষায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার জন্মে না। বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত—দুই খানি অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য; ইহার ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল যে, বিনা যত্নে বোধগম্য হয়। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি, যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে অতুল আনন্দ হয়। ফলতঃ রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি দুর্লভ। আমাদের গৃহ কামিনীরা কেন যে ইহা পাঠ করিতে বিরত হইয়াছেন তাহা ভাবিয়া পাই নাই। তবে যদি জানিতাম যে, বঙ্গভাষায় এক্ষণে মহাভারত বা রামায়ণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত কোন উৎকৃষ্ট কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল স্ত্রীলোকের পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে। লক্ষ্মী ডোমনীর চরিত্র, ধুমসীর চরিত্র, এবং কানড়া কলিঙ্গা প্রভৃতির চরিত্র গত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক সদুপদেশ লাভ করিতে পারেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবিতা যেমন সরস, সতেজ, সরল, তেমনি আবার উপদেশপূর্ণ।

প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় আজিও স্ত্রীলোকের পাঠ্য এমত পুস্তক হয় নাই, যদ্দ্বারা রামায়ণ বা মহাভারতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে। "তুমি কি আমার?" "আমি কি

তোমার ?" "সে কি আমার ?" প্রভৃতি পদ্যের যদিও ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়,কিন্তু ঐ সকল পদ্যের দ্বারা যে স্ত্রীলোক-দিগের কিছুমাত্র উপকার হয় না, ইহা নিশ্চয়। আবার মাইকেলের মেঘনাদ ও হেমবাবুর বৃত্রসংহার অতি অল্প স্ত্রীলোকেই বুঝিতে পারেন। বিশেষ মেঘনাদ বা বৃত্র-সংহার পড়িলে, যে মহাভারত পড়া অনুচিত এমন কোন কথা নাই—বরং আদি পুস্তক বিশেষরূপ জানা থাকিলে এই সকল পুস্তক পাঠে ভালরূপ অধিকার জন্মে। মহা-ভারতে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে আমাদের বোধ হয়, আর কিছু দিন পরে আমাদের মহিলারা মেঘনাদ কে, এই কথা স্বামীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তাঁহারা কি উত্তর দিবেন তাহা ভাবিয়া অস্থির হইবেন—লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বঙ্গ মহিলাদিগের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতকে পুনরায় পাঠ্য পুস্তক মধ্যে গ্রহণ করুন, ইহাতে তাঁহাদের অনেক উপকার হইবে। এত দিনের পর আবার মহাভারত ও রামায়ণের প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছি বলিয়া অনেকে আমাদের উপর হয়ত বিরক্ত হইবেন। কিন্তু আমরা উপরেই উল্লেখ করিয়াছি, যে, কতক-গুলি সামান্য দোষ থাকিলেও রামায়ণ মহাভারত অপূর্ব্ব বস্তু;—তাই আমাদিগের এ চেষ্টা। রামায়ণ ও মহাভারত যে কারণে আধুনিক যুবক বা যুবতীরা অপাঠ্য জ্ঞান করেন, বাঙ্গালার কোন কাব্যের পক্ষে সে কারণ দর্শান যাইতে না পারে? যদি স্থানে স্থানে মন্দ-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়

বলিয়া রামায়ণ বা মহাভারত অপাঠ্য হয়, তবে বাঙ্গালার প্রায় সমুদায় কাব্যই অপাঠ্য।

কিন্তু আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, রামায়ণ মহাভারত ভিন্ন বাঙ্গালা-ভাষায় আর কোন পাঠ্য পুস্তক স্ত্রীলোকদিগের নাই। সীতার বন বাসের ন্যায় পুস্তক তাঁহারা উত্তম রূপ পাঠ করুন। তাঁহাদিগকে দুই চারি খানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাঠ করিতে দিতে আমাদের আপত্তি নাই। আর লীলাবতীর ন্যায় পুস্তকের সমুদয় অংশ যদি তাঁহারা উত্তম রূপ বুঝিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমাদিগের আনন্দের সীমা থাকিবে না—আমাদের আপত্তি কেবল মন্দ পুস্তক পাঠে।

বঙ্গ মহিলা কিরূপে পুস্তক পাঠ করিবেন।

সত্য বটে, আজি কালি বিদ্যার আলোচনা রমণীদিগের মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় বিদ্যার অবমাননাও হয়। কালাপেড়ে সাটী পরা বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক হস্তে রমণী-দিগকে আজি কালি প্রায় সকলের গৃহ প্রকোষ্ঠে বিচরণ করিতে দেখা গিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের হস্তে পুস্তক দেখিয়া তাঁহাদের ভ্রাতা বা স্বামীদিগের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়—পাছে অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। যদি আপ-নার দুই চারিজন পাড়া প্রতিবেশিনী আত্মীয়া রমণী থাকেন, তবে বেলা দুই প্রহরের সময় একবার তাঁহাদিগের ভবনে বেড়াইতে যাইবেন। দেখিবেন, কেহ "দীপ-নির্ব্বাণ" হস্তে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কেহ "সরোজিনীর' দুঃখ ভাবি-তেছেন, কাহারও বক্ষে "স্বর্ণলতা" শোভা পাইতেছেন, কিন্তু 'বান্ধব" বা "আর্য্য দর্শনের" দর্শন নাই—"প্রভাত-চিন্তার" চিন্তা কেহ করিতেছেন না।

পুস্তক পাঠ দুই প্রকার; এক চিন্তার সহিত পাঠ, আর বিনা চিন্তায় পাঠ। বঙ্গদেশে শেষোক্ত প্রকারের পাঠক সংখ্যাই অধিক, পাঠিকার তো কথাই নাই। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, যে, একটি রমণী হয় তো দশ বার খানি নাটক ও উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, দীনবন্ধু মিত্রের "ছড়া" অনর্গল বলিতে পারেন; কিন্তু সামান্য একটি ছত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না।

এরূপ পাঠের ফল কি? আমরা মহিলাদিগকে নাটক বা উপন্যাস পাঠ করিতে একেবারে নিষেধ করি না, কারণ কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সেই ভাষার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পুস্তক পাঠ করিতেই হয়। অনেক গুলি পুস্তক পাঠ না করিলে ভাষায় জ্ঞান জন্মে না। লিখিবার ক্ষমতা তো একেবারে হয়ই না—যাঁহার লিখিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, তাঁহার বিদ্যা থাকিয়া না থাকার তুল্য। কিন্তু ঐ অনেক গুলি পুস্তক মধ্যে আবার এমন কতকগুলি পুস্তক নির্ব্বাচিত করিতে হয়, যাহা বিনা চিন্তায় বুঝিতে পারা যায় না। বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে চিন্তা শক্তির সঞ্চালন, যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদিগের রমণীরা জানেন না; কি-রূপে জানিবেন? পাছে অর্থ বলিয়া দিতে হয়, এই আশঙ্কায় অনেক স্বামী বা ভ্রাতা একেবারে কঠিন পুস্তক কিনিয়াই দেন না। যদি বা সভ্যতার অনুরোধে বা বন্ধুর নিকট গর্ব্ব করিবার অভিলাষে দুই একখানি কঠিন পুস্তক কিনিয়া দেন, কিন্তু কি রূপে তাহা পাঠ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন না। আমরা আজি তাহা যথা সাধ্য বলিয়া দিব।

কোন এক খানি কঠিন পুস্তক লইয়া প্রথমতঃ খানিকটা পাঠ করিবেন। পরে যে ছত্রটি সহজে বুঝিতে না পারি-লেন তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করিবেন; পাঠ করিয়া একটু চিন্তা করিবেন। যদি দ্বিতীয়বারেও বুঝিতে না পারেন, তবে তৃতীয়বার পাঠ করিবেন। নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া দুই চারি জন লোকের লেখা ছাড়া, যেমন কেনই পুস্তক হউক না, তৃতীয়বার পাঠ করিলে নিশ্চয়ই তাহার অর্থ বোধ হইবে।

যদি একান্তই না হয়, তবে স্বামী বা ভ্রাতার নিকট বুঝাইয়া লইবেন—কিছুতেই ছাড়িবেন না। এই নিয়মে যদি কোন কঠিন পুস্তক শেষ করিতে পারেন ও তিন চারি খানি পুস্তক যদি এই প্রথায় শেষ করা হয়, তাহা হইলে আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, কোন মহিলার কোন সহজ পুস্তক পাঠ করিতে ঠেকিবে না এবং সকলেরই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে। কিন্তু এইরূপে পাঠ করিতে অত্যন্ত ধৈর্য্য চাই। উপাখ্যান ঠিক এই নিয়মে পাঠ করা যাইতে পারে না। উপাখ্যান পুস্তক প্রথমে একবার গল্পের অনুরোধে পাঠ করিয়া যাইতে হয়। পরে কয়েক দিন আর ঐ পুস্তক পাঠ করিতে ভাল লাগে না। তদনন্তর গল্পটা একটু পুরাতন হইলে, পুনরায় পাঠ করিতে হয়, এইরূপে তিন চারি বার পাঠ করিলে উক্ত পুস্তক সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হয় ও উহার অনেক স্থল কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। আমরা ইহা অস্বীকার করি না, যে কোন কোন মহিলা দুই একখানি পুস্তক অধরস্থ করিয়া ফেলেন। আমরা তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া তাঁহারা আমাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি, যে, তাঁহারা যদিও "চেয়ে দেখো চন্দ্রাবলি ভুবন আলো করেচে, জাম্বুবানের পদ্ম-মুখে ভোমরা এসে বসেচে." প্রভৃতি কবিতা অবাধে বলিতে পারেন, কিন্তু "পড়েছে অলক্ত রস শত-দল-দামে" প্রভৃতি কবিতার ন্যায় কোন কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, কখন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবেন না। বঙ্কিম বাবুর হরিদাসী বৈষ্ণবীর বাক্য সমুহের প্রতি অক্ষর হয় তো অনেকে বলিতে পারি-

বেন, কিন্তু “হরদেব ঘোষালের” পত্রের সারাংশ খুব অল্পেরই মনে আছে। প্রথমবার পাঠকালে কোন পুস্তকের কঠিন অংশ সকল শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া গেলে তত ক্ষতি নাই। কিন্তু দ্বিতীয়বার পাঠের সময় বিশেষরূপ মনঃসংযোগে পড়া আবশ্যক, নতুবা পড়ার কোন ফল হয় না।

বঙ্গদেশের পাঠকেরা যেরূপ অভিধান দেখিতে আলস্য বোধ করেন, এমন আর কোন দেশের পাঠকেরা করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের উদাহরণ দেখিয়া পাঠিকারা একেবারে অভিধান স্পর্শ করেন না—অভিধান দেখা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা ভ্রমেও ভাবেন না। আপনারা যখন কোন পুস্তকে কোন কঠিন শব্দ দেখিবেন, তখনই অভিধান খুলিয়া তাহার অর্থ জানিয়া লইবেন। ইহাতে দুইটি উপকার হইবে; প্রথম শব্দ সকলের যথার্থ অর্থ জানিতে পারিবেন, দ্বিতীয় বানান শুদ্ধ হইবে।

ফলতঃ বিনা পরিশ্রমে কাহারও বিদ্যাশিক্ষা হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মহিলারা যে পরিমাণে পুস্তক পাঠে পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা আর একটু বেশী পরিশ্রম করা তাঁহাদের উচিত। আর এটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, যে, লেখা পড়া শিক্ষা করার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান-বৃদ্ধি ও চিত্ত-শুদ্ধি; সেই জন্য উত্তম কাব্য ও বিজ্ঞানের পুস্তক উভয়ই সমান আলোচ্য। রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণের সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী-বিদ্যা, শরীর-পালন প্রভৃতি পুস্তকও পড়া কর্ত্তব্য। আর কাব্যই হউক, বিজ্ঞানই হউক, বুঝিয়া পড়া আবশ্যক।

বঙ্গ মহিলার উপাখ্যান ও নাটক পাঠ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা।

বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, যে, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতা বঙ্গ-রমণী মাত্রেই দুই চারিখানি উপাখ্যান বা নাটক পাঠ করিয়া থাকেন—নাটক পাঠ রমণীদিগের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময়ে নাটক ও উপাখ্যান পাঠের ফল কি, কি প্রকার নাটক বা উপাখ্যান পাঠের উপযুক্ত—ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিতে অভিলাষ করি।

বঙ্গভাষায় উপাখ্যানের সংখ্যা পিপীলিকার সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই পাঠ্য নহে। অধিকাংশ উপাখ্যান অস্বাভাবিক দোষে দূষিত; উহা পাঠে মনোমধ্যে অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হয়। নায়িকার বয়ঃক্রম লইয়া সাধারণতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থকারেরা বড় বিপদে পতিত হয়েন। দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়ঃক্রমে বঙ্গদেশে বালিকাদিগের বিবাহ প্রায় হয় না; এবং দ্বাদশ বর্ষে কোন বালিকারই সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না—প্রণয় অপ্রণয় বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে না, সুতরাং গ্রন্থকারদিগকে প্রায়ই বঙ্গ দেশীয় নায়িকাদিগের দুইচারি বৎসর বয়ঃক্রম বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়—এদিকে গ্রন্থ অস্বাভাবিক দোষে দূষিত হয়। বাঙ্গালা উপাখ্যান সমূহ প্রায় ইংরাজির অনুকরণে লিখিত। ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার অনুসারে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, আমাদিগের আচার ব্যবহার অনুসারে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে,—ইংরাজ স্ত্রী স্বামীর সহিত যেরূপ সম্ভাষণ

ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, বাঙ্গালি স্ত্রী সেরূপ করিলে দোষের কথা হয়। অনেক অজ্ঞ উপাখ্যান-লেখক এ সকল কথা বিস্মৃত হন; তাঁহাদিগের লিখিত পুস্তক পাঠ করিতে নাই। সৌভাগ্যের বিষয় বঙ্গীয় সকল গ্রন্থকারই এ দোষে দোষী নহেন। যাঁহাদিগের গ্রন্থে এসকল দোষ নাই, তাঁহাদিগের গ্রন্থ ভিন্ন অন্য গ্রন্থ পাঠ করিলে এরূপ কতকগুলি দোষে আমাদিগের মহিলারা আক্রান্ত হইতে পারেন, যাহা পরিশেষে অসুখের হেতু হয়; এবং যাহার জন্য তাঁহাদিগের স্বামীরা মনোবেদনা প্রাপ্ত হয়েন। স্পষ্ট বলা—ইংরাজদিগের নারীকুলের মধ্যে দোষ বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের দেশে অনেক সময়ে স্পষ্ট কথা চাপিয়া না রাখিতে পারিলে, মুখরা নামে অখ্যাত হইতে হয়—ইহা আপনারা জানেন। আমাদিগের অনেক উপাখ্যানের নায়িকারা অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যখন ঘাড় বাঁকাইয়া কাহারও সহিত "সমান উত্তর" করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের উপর আমাদিগের বড় বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে এবং ভয় হয় পাছে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগের মহিলারাও ঐরূপ "সমান উত্তর" করিতে শিক্ষা করেন।

যে উপাখ্যানের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, সেই উপাখ্যান মহিলাদিগের পাঠ করা কর্ত্তব্য। অধিকাংশ ইংরাজি উপাখ্যানের ভাষা এত উৎকৃষ্ট যে উহা পাঠ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কয়েক জন লেখক ভিন্ন অনেকেরই ভাষা অপাঠ্য—না আছে

ভাষায় মিষ্টতা, না আছে বিশুদ্ধ ভাব। একখানি বাঙ্গালা উপাখ্যানের এক স্থানে আছে ;—

"সখীরে তু বোলো
কাহে এত মন মজিলো
যব দেখিনু সো হাসি,
পরাণে হৈনু উদাসী
স্বর শুনি হইনু পাগল।"

শুনিয়াছি এই পুস্তক খানি কোন ভদ্র মহিলা লিখিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার পুস্তকে ব্রজ-বুলি ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং হয় তো মনে ভাবিয়াছেন যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই ব্রজ-বুলি। কিন্তু উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির মধ্যে কোন শব্দটী ব্রজের তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে গ্রন্থকারিণীর কোন দোষ নাই, তিনি অনেক গ্রন্থকারকে বোধ হয় ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন ও তাঁহাদিগের অনুকরণে লিখিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠ করা ও তাঁহার লেখার অনুকরণে লেখার ফলই এইরূপ। এই হেতু স্বামীদিগের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—এবং স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য নির্ব্বাচিত পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পাঠ না করা।

উপাখ্যানের ভাষা ও উহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিলাম ; এক্ষণে উহা পাঠে আমাদিগের কি বিশেষ লাভ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। যদি মনোযোগ দিয়া খান কতক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান পাঠ করা যায়, তাহা হইলে প্রায় সকল প্রকার মনুষ্যের স্বভাব বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভালরূপ উপাখ্যান পাঠ করা থাকিলে, যেমনই কেন লোক হউক না, তাহার ধরণ ধারণ কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। নানা প্রকার লোকের স্বভাব চরিত্রের বিবরণ, তাহাদিগের সুখ দুঃখের কথা প্রভৃতি পাঠ করিলে মন প্রশস্ত ও পরদুঃখ কাতর হয়। উপাখ্যান পাঠে নীতিশিক্ষা ও অনেক হইয়া থাকে। সূর্য্যমুখীর মত স্বামীভক্তি দেখাইতে পারিলে তবে উপাখ্যান পাঠের ফল বুঝিতে পারা যায়। আমরা একটি উদাহরণ দিলাম, অনুসন্ধান করিলে আপনারা শত শত উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন। কোন একখানি উপাখ্যান পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহাতে বিশেষ শিক্ষণীয় কিছু আছে কি না, যদি থাকে, তবে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবেন—কোন সময়ে কার্য্যে লাগিবে। গৃহে বসিয়া দেশ বিদেশের লোকের আচার ব্যবহার জ্ঞাত হইবার সহজ উপায়—উপাখ্যান পাঠ অপেক্ষা আর নাই। তবে বৃথা আমোদে মত্ত হইয়া যদি সার গ্রহণ করিতে চেষ্টা না করেন, তবে সে আপনাদিগের নিজের দোষ। আমাদের মতে আজি কালি যেরূপ চক্ষে বঙ্গমহিলা দ্বারা উপাখ্যান সমূহ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে. উহা সেরূপ দৃষ্ট হইবার সামগ্রী নহে—উহা কেবল আমোদের ভাণ্ড নহে, জ্ঞানের আকর। উহা কেবল হাসিয়া খেলিয়া পাঠ করিলে হয় না, ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঠ করিতে হয়।

উপাখ্যান সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, নাটক সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে, তবে নাটক পাঠ আর একটু

সতর্কতার সহিত করা আবশ্যক। নাটক বুদ্ধিকে বড় হাল্‌কা করে। বাঙ্গালা ভাষায় ভাল নাটকের সংখ্যা বড় কম। আমাদিগের মতে নাটক অপেক্ষা উপাখ্যান পাঠ ভাল। তবে কুস্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করা যায়, এই মত অনুসারে চলিলে মন্দ পুস্তক হইতেও অনেক ভাল বস্তু শিক্ষা করিতে পারা যায়। আমরা ভরসা করি, উপাখ্যান ও নাটক পাঠসম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু লিখিলাম পাঠিকারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা।

বঙ্গমহিলার পত্রলেখা সম্বন্ধে
দুই চারিটি কথা।

অধুনা পত্র লেখা বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়। এক্ষণে বঙ্গদেশস্থ অনেক ভদ্রপল্লীতে ডাকহরকরাকে শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতির নামে পত্র বণ্টন করিতে দেখা গিয়া থাকে; এবং দুই চারিজন সেকালের লোককে এই কারণে "কলির পূর্ণাবস্থা উপস্থিত, এক্ষণে মা গঙ্গা গ্রহণ করিলেই আর—অখাদ্য ভোজন, বিধবার বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের পত্র লেখা, প্রভৃতি পাপ কার্য্য দেখিতে হয় না" ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতে শ্রবণ করা যায়। পত্রলেখা প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ পত্রলেখা প্রার্থনীয়, সেরূপ পত্র খুব অল্প স্ত্রীলোকেই লিখিয়া থাকেন। অনেক পুরুষে বিবেচনা করেন পত্রলেখার উদ্দেশ্য সংবাদ দেওয়া, তা কোন প্রকারে দিতে পারিলেই হইল, তজ্জন্য পৃথক করিয়া কাহাকেও কিছু বলার প্রয়োজন নাই। আমরা তাহা ভাবি না। সেই জন্য মহিলাদিগের পত্রলেখা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

একটি সুন্দর পুরুষ দেখিলে আমাদের যেমন প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ একখানি অতি পরিষ্কার অক্ষরের লেখা পত্র দেখিলে, প্রথমেই উহার উপর এক প্রকার

ভক্তি জন্মে, উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যেরূপ একজন কদাকার, অপরিষ্কার পুরুষকে দেখিলে তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়াই তাহার উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, সেইরূপ অতি কদর্য্য অক্ষরে লিখিত কোন উৎকৃষ্ট বিষয় ও পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। উহার প্রতি প্রথমেই অভক্তি জন্মে সুতরাং ভাল মন্দ বিচার করিবার ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা না থাকিলেও পরিষ্কার-অক্ষরে-লেখা কোন বিষয় দুই দণ্ড পাঠ করা যায়, আর ইচ্ছা থাকিলেও কদর্য্য অক্ষরে লিখিত কোন বিষয় অধিক ক্ষণ পাঠ করিতে পারা যায় না। অতএব সকল রমণীরই হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট করিতে যত্ন করা উচিত। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের লেখা সাধারণতঃ অপাঠ্য, হস্ত-পদ-হীন অক্ষর গুলি এক এক দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে আর যেন বলিতে থাকে,—"হে বঙ্গ মহিলা সকল! আর আমাদের প্রতি অত্যাচার করিও না।" প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য এই অত্যাচার নিবারণ করা। কিন্তু তাঁহারাই বা কি করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দশাই প্রায় ঐরূপ। আবার অনেক রমণী আছেন তাঁহারা ক, খ, লিখিতে শিখিয়াই পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বহু পুণ্যে তাঁহাদের লেখা পাঠ করা যায়। অনেকের আবার প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই লেখার উন্নতি করিবেন না, তা যিনিই কেন যত যত্ন করুন না। ইহা যে খুব ভাল এমন বলিতে পারি না।

পত্র উচ্চ দরের ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কাউপার নামক একজন ইংরেজ কবি তাঁহার আত্মীয়া একটি

রমণী ও একজন বন্ধুকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্র গুলি এমন সুন্দর রূপে লিখিত এবং উহাতে এরূপ মনোহর স্বভাব বর্ণনা আছে যে, উহা এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিণত হইয়াছে। পত্রে যে কেবল "আমি ভাল আছি, তথাকার মঙ্গল সংবাদে সুখী করিবে" ভিন্ন আর কিছু লিখিতে নাই, এমন নহে। পার্শ্ববর্ত্তী এক একটি সামান্য ঘটনার বর্ণনায় এক এক খানি পত্র পূর্ণ করা যাইতে পারে। আমরা এই স্থলে দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিব, যথা; দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ভোজ ফলার ইত্যাদি—এই সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করিয়া পত্র লেখা যাইতে পারে। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে বিষয়ের অভাব হয় না। এরূপ লেখার ফল এই হয়, যে, ভবিষ্যতে লিখিবার ক্ষমতা জন্মে ও ভাষায় অধিকার হয়। স্ত্রীলোকেরা যে কখন ভালরূপে লিখিতে শিখিবেন না, চিরকালই ছাই ভস্ম লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবেন, এমন কোন কথাই নাই। তাঁহারা যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রচনা পাঠ করিবেন, বা সংবাদ পত্রে প্রস্তাব লিখিবেন, বা অন্য কোন প্রকারে রচনার উন্নতি করিবেন এমন সম্ভাবনা বরং অল্প। সুতরাং পত্র দ্বারা রচনার উন্নতি করাই প্রশস্ত উপায়। দীর্ঘ পত্র লেখা অনেকের পক্ষে বড় কষ্টকর; তাঁহারা কোন মতেই দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারেন না। দীর্ঘপত্র লেখা আমাদিগের মতে খুব ভাল। জীবনের সমস্ত সময়টাই তাস খেলায় না অতিবাহিত করিয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টা এক খানা পত্র লেখায় অতিবাহিত করিলে

কি ক্ষতি হইতে পারে? বিশেষ প্রত্যহই কিছু পত্র লিখিবার প্রয়োজন হয় না।

কোন বিষয়ে কিছু লিখিতে হইলে বানানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা চাই। স্ত্রীলোকদিগের বানান ভুল যে কত হয়, তাহা বলা যায় না। অনেকে একেবারে যুক্তাক্ষর লিখিতেই পারেন না। বানান অশুদ্ধ লেখা লেখাই নহে। বানান শুদ্ধ করিয়া লেখা বড় কঠিন কথা, তবে যত কম ভুল হয় ততই ভাল। বানান শুদ্ধ করিবার প্রধান উপায় পুস্তক পাঠকালে প্রতি শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও অধিক পরিমাণে লেখা; লিখিতে লিখিতে ক্রমে বানান শুদ্ধ হইয়া যায়।

পত্রের পাঠ অনেকে অনেক প্রকার লিখিয়া থাকেন। কেহ স্বামীকে "প্রাণেশ্বর" কেহ "প্রিয়তম" লেখেন। কেহবা ইহা অপেক্ষাও মধুরতর কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর সকলেই প্রায় প্রতি ছত্রের প্রথমে ও শেষে "ভাই" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। "প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি শব্দে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমাদের আপত্তি এই "ভাই" শব্দের উপর। আমরা এই শব্দ ব্যবহারের কোন সার্থকতা দেখিতে পাই না। স্বামীর সহিত স্ত্রীর যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে স্বামীকে কিছুতেই ভাই সম্বোধন করিতে পারা যায় না, অথচ আমাদের মহিলারা ঐরূপ সম্বোধন করিয়া গুরুতর দোষ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোককেও ভাই সম্বোধন করিতে পারেন না, অথচ আমরা অনেক পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে এক জন স্ত্রীলোক অপর এক জন

স্ত্রীলোককে লিখিয়াছেন, "ভাই প্রমীলা" ভাই "নিস্তারিণী" ইত্যাদি এইরূপ পত্র পড়িলে বোধ হয়, লেখিকারা ভাই শব্দটা বিনা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা মহিলা-দিগকে ভাই শব্দ কেবল ভ্রাতার প্রতি ব্যবহার করিতে অনু-রোধ করি।

এক একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রথম প্রথম দুই চারিটি ইংরাজির কঠিন শব্দ শিক্ষা করিয়া, কোন্ স্থলে উহা ব্যব-হার করিতে হয় তাহা না জানিয়া, সকল স্থানেই ব্যবহার করিয়া, যেরূপ অল্প বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন, এক এক জন নবীনা লেখিকাও সেইরূপ "কাদম্বরী" প্রভৃতির "মুখচন্দ্র" "দাক্ষিণ্য শূন্য" প্রভৃতি শব্দ শিক্ষা করিয়া সকল স্থানেই ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া বসেন। প্রত্যেক শব্দ স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং শব্দের ব্যবহার বিশেষরূপ জানা আবশ্যক। পত্রের ভাষা যত সরল হইবে ততই উত্তম—কতকগুলি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি-লেই বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পায় না।

পত্র লিখিয়া একবার পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা অনেক ভুল থাকে,—কথাটা নিতান্ত উপহাসের নহে। অনেকে এই বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া এমন সকল পত্র স্বামীদিগের এবং অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া থাকেন যে, তাহার অর্থ অনেক কষ্টে তাঁহারা সংগ্রহ করেন ; এক এক ছত্রের অর্থ একেবারে হয়ই না। সুতরাং লেখিকাদিগের পত্র লেখার উদ্দেশ্য অনেক সময় বিফল হইয়া যায়। এজন্য তাঁহাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া চাই।

পত্র লেখা সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই—পত্রগুলি সরল ভাষায় লিখিত হইবে ; কঠিন শব্দ বেশী থাকিবে না ; বানান শুদ্ধ হইবে ; লিখিয়া পাঠ না করায় যে সকল সামান্য সামান্য ভুল হইয়া থাকে তাহা হইবে না এবং পত্রে সুসঙ্গত পাঠ লেখা হইবে।

বঙ্গমহিলা কিরূপে সময়ের ব্যবহার করিবেন।

বঙ্গ-মহিলা সময়ের ব্যবহার জানেন না। সময়কে ভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগে এক একটী কার্য্য করিতে হয়—ইহা বোধ হয় তাঁহারা জানেন না। জানিলেও কার্য্যে বড় করেন না। দিবসের মধ্যে ক্ষণেক সময় গৃহকার্য্যে, ক্ষণেক সময় পুস্তক পাঠে, ক্ষণেক সময় শিল্পকার্য্যে—এইরূপে অতি অল্প মহিলাই সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা এক একটী কার্য্যেই সময় কাটান। যিনি গৃহকার্য্য করিবেন তিনি সমস্ত দিনই গৃহকার্য্য করিবেন; আবার যিনি শিল্প-কার্য্য করিবেন তিনি দিবারাত্র শিল্পকার্য্য লইয়াই থাকি-বেন; অন্য কার্য্য তিনি করিবেন না। এইরূপ করিলে সকল বিষয়ে সমান অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। কিন্তু সকলে আবার এরূপেও সময়ক্ষেপ করেন না। আমরা যত দূর অবগত আছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গ-মহিলার অধি-কাংশ সময় তাস খেলায় ও নিদ্রায় অতিবাহিত হয়।

তাস খেলা বঙ্গ-দেশের যে কি প্রিয় বস্তু তাহা বলা যায় না। তাসের নাম শুনিলে বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা—সকলেই অজ্ঞান হন। উকীল মহাশয় তাস খেলিতেছেন, মক্কেল আসিয়াছে, মোকদ্দমার কথা বার্ত্তা কহিতেছে, বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া যাইতেছে—উকীল বাবুর ভ্রূক্ষেপও নাই। ডাক্তার মহাশয় তাস খেলি-তেছেন, লোকে ঔষধের জন্য বিরক্ত করিতেছে, রোগীর

অবস্থা ভাল নহে বলা হইতেছে—কে শুনে? বঙ্গ-মহিলা তাস খেলিতে বসিয়াছেন; সম্মুখে ছেলেটি বসিয়া ময়লা করিয়াছে, তাহা গাত্রে মাখিতেছে, হয় ত তাহার আস্বাদনও লইতেছে—গ্রাহ্য নাই। ফলতঃ তাস খেলায় যেরূপ মনুষ্যকে অলস ও উন্মত্ত করিয়া ফেলে, এমন আর কিছুতেই করে না। যাহাদিগের সময় কিছুতেই কাটে না, তাহারাই তাস খেলার আশ্রয় গ্রহণ করে। নিদ্রায় বড় অল্প সময় মহিলাদিগের ব্যয় হয় না। আমরা জানি, অনেক রমণী আছেন, তাঁহারা দিবাভাগে অতি কষ্টে আহার সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানাবস্থায় থাকেন, আহার সমাপ্ত হইলেই অমনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। পরে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া যে অল্প সময় থাকে, তাহা তাস খেলায় বা অঙ্গের বিলাস সম্পাদনে অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই আবার নিদ্রা। অত্যল্প রমণীই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করেন। সকলে এই নিয়মে পুস্তক পাঠ করিলে আমাদিগের দুঃখের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু আমরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এই সকল গুণ তাঁহারা পুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন; তবে তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, পুরুষেরা অলস হইলেও অনেক ভাল ভাল কার্য্য প্রত্যহ তাঁহারা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের দিন নিতান্ত বৃথায় অতিবাহিত হয় না।

আর একটী কার্য্যে বঙ্গ-মহিলা সময় ক্ষেপণ করেন; তাহা উলের কার্য্য—শিল্প কার্য্য বলিতে পারি না; কেন না, উলের

কার্য্য ভিন্ন অন্য শিল্পকার্য্য করিতে কোন মহিলাকে দেখি না। উলের কার্য্যই যে এক মাত্র শিল্পকার্য্য তাহা নহে, আরও অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য আছে। সেলাই করা একটি শিল্প-কার্য্য; উলের কার্য্যে আমাদিগের মহিলারা যে পরিমাণে সময় দিয়া থাকেন, সেলাই কার্য্যে সে পরিমাণে দেন না। আমরা সময়ে সময়ে দুই এক জোড়া কার্পেটের জুতা পায়ে দিয়া সগর্ব্বে রাস্তায় হাঁটিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মনে হিংসা উৎপাদন করিয়াছি, সুতরাং উলের কার্য্য যে একেবারে উপকারী নহে, এ কথা বলিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, উলের কার্য্য অপেক্ষা সেলাইকার্য্য বেশী প্রয়োজনীয়। একটী বালিশের খোল না হইলে বালিশ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এক জোড়া কার্পেটের জুতা না হইলে কোন ক্ষতি হয় না—বিশেষ উলের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যয় হয়। অতএব সেলাই কার্য্যে আমা-দিগের মহিলাদের বেশী সময় দেওয়া উচিত। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের পিরাণ, বিছানার চাদর, বালিশের খোল প্রভৃতির সেলাইয়ের জন্য গৃহস্থের এক পয়সাও খরচ করা অনুচিত। সঙ্গতি থাকিলে উলের কার্য্য করিতে বাধা নাই, কিন্তু তৎসঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় সেলাই কার্য্য থাকা চাই।

ধর্ম্মের আলোচনায় দিবসের কিয়দংশ অতিবাহিত করা আবশ্যক—একথা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বলা বৃথা। বঙ্গ-দেশ হইতে ধর্ম্মের চর্চ্চা দিন দিন চলিয়া যাইতেছে, অধি-কাংশ শিক্ষিত যুবা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা জানিতে পারা যায় না। সুতরাং রমণীদিগের যে ধর্ম্মের স্থির থাকিবে না, তাহা

বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আমরা তথাপি বলিতেছি, যে ধর্ম্ম কর্ম্মে কিছু সময় প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস, তিনি সেই ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।

আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই—সময়কে ভাগ করিয়া এক এক ভাগে এক একটী কার্য্য করিতে হইবে। তাস খেলা প্রভৃতি অলসের কার্য্যে সময় অতিবাহিত না করা উচিত। শিল্পকার্য্যে বেশী উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য তাহাতে বেশী সময় দেওয়া ভাল। ধর্ম্মালোচনায় কতক সময় না দেওয়া পাপ—মোট কথা, যে প্রকারে সময়ের ব্যবহার করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পারদর্শিতা লাভ হয়, সময়ের সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গ মহিলার পরিচ্ছদের বিষয়।

বঙ্গ দেশের মহিলাদিগের পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ উন্নতি হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা বিস্তর হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনাও আছে—কার্য্যে কিন্তু কিছুই হয় নাই। যাঁহাদের বিষয় তাঁহারা যদি মন দেন, তবে অল্প কাল মধ্যেই আমরা অনেক উন্নতি দেখিতে পাই—তাই আমরা তাঁহাদিগের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

পরিচ্ছদের মধ্যে পরিধেয় বসনই প্রধান। ভদ্র পরিবার মধ্যে যে সকল পরিধেয় বস্ত্র আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই এরূপ পাতলা যে, তাহা পরিধান করা, না করা সমান। এই সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া রমণীরা যখন আমাদিগের সম্মুখে বাহির হন, তখন আমাদিগের অতিশয় লজ্জা বোধ হয় এবং ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত পাতলা বস্ত্র গুলি অগ্নিদেবকে প্রদান করি। পাতলা বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পুরু বস্ত্র ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিলাতী থান খুব পুরু বটে, কিন্তু "ভোমরা পেড়ে" "পাছাপেড়ে" "কোকিল পেড়ে" প্রভৃতি বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ছাপার পাড় লাগান থান পরিতে ব্যবস্থা দিতে পারি না—দিলেই বা শুনিবে কে? আমরা আপনারাই যখন "রেইল পেড়ে" "কাশী পেড়ে", প্রভৃতি ধুতির মায়া ভুলিতে পারি না, তখন কোন্ মুখেই বা তাঁহাদিগকে থান পরিতে বলিব? অতএব পাতলা বস্ত্র একেবারে পরিতে না দিতে অভিলাষ আমাদিগের নাই। তবে যাহাকে "পোষাকী কাপড়" বলে, তৎসম্বন্ধে আমাদের

বক্তব্য এই, যে, একটু বেশী মূল্য দিয়া উক্ত প্রকারের বস্ত্র ক্রয় করা ভাল। যাঁহাদের অবস্থা মন্দ তাঁহারা সংখ্যায় বেশী বস্ত্র ক্রয় না করিয়া "বিরাজের" সহিত তুলনা দিবার অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দুই একখানি বেশী মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন। অধিক মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অধিক মূল্য দিলে দ্রব্য ভাল হয়। যে শান্তিপুরে সাটীর নাম করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়, সেই শান্তিপুরে সাটী অধিক মূল্যের পরিধান করিলে শরীরের বর্ণ পর্য্যন্ত দেখা যায় না—ভাল পোষাকী কাপড় পরিধান করিতে দিতে আমাদিগের আপত্তি নাই, পাতলা কাপড় পরিধানেই আমাদিগের আপত্তি। কতকগুলা বস্ত্র চাহিয়া বিরক্ত না করিলে, প্রায় সকল স্বামীই দুই এক খানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রদান করিতে পারেন।

যদিও কখন কখন পাতলা বস্ত্র পরিধান করিবার ব্যবস্থা দিতে পারি, কিন্তু পাতলা বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর বাহির হইতে বা কোন উৎসব-স্থানে যাইতে বা আগন্তুক কোন ভদ্র ব্যক্তির সম্মুখে বাহির হইতে কদাচ সম্মতি দিতে পারি না। অল্প মূল্যের "পোষাকী" পাতলা বস্ত্র পরিধান করিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে দিতেও আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি, কোন বিবাহ উপলক্ষে বা পূজা উপলক্ষে আমাদের মহিলারা চেলির সাটী পরিধান করিয়া থাকেন—এই নিয়মটী বড় উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ ষষ্ঠীর পূজা দিতে যাইবার সময় বা বরণ করিবার সময় এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়া

আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, এই সকল সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে হয়, তাই এই সুনিয়মটি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের মত এই যে, যে কোন সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে হয়, সেই সময়েই তাঁহাদিগের বালুচরের সাটী বা অন্য কোন রেশমের সাটি পরিধান করিয়া বাহির হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ও হ্রাস হয় না, লজ্জা-হীনাও হইতে হয় না। বাটীর মধ্যে অবস্থিতিকালে সাধারণতঃ মোটা সাটী পরিধান করাই বিধি। মহিলারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের "কেরেপের" বস্ত্র গুলির দশায় কি হইবে?—সে গুলি রাত্রিকালে ব্যবহার করিতে পারেন, অন্য কোন সময়ে পারেন না। এক হিসাবে আমরা তাঁহাদিগকে সকল প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিলাম,—মোটা কাপড় সর্ব্বদা পরিতে পাইবেন, পোযাকী ভাল বস্ত্র সময়ে সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন, ভদ্র বেশে বাহির হইতে হইলে রেশমের বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন, কেরেপের বস্ত্র প্রভৃতি রাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন না; মোটা কথা ভদ্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া এবং লজ্জার মস্তক না খাইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করা উচিত।

পরিচ্ছদের মধ্যে পিরাণ দ্বিতীয়। বঙ্গ দেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আঙ্গরাখার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে বঙ্গ দেশের অনেক

নগরের ভদ্র রমণীরা পিরাণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পল্লী গ্রামেরও দুই চারি জন পিরাণ ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধাদিগের বিদ্রূপের পাত্রী হইতেছেন; কিন্তু এখনও বঙ্গ দেশে পিরাণ রমণীদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য হয় নাই—এখনও ইহার অভাব প্রায় অনেকে বোধ করেন না এবং পিরাণ গাত্রে না দিলে লজ্জা শূন্য হইতে হয় এ জ্ঞান সকলের জন্মে নাই। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, "যদি আমরা পিরাণ গাত্রে দিই তাহাহইলে অলঙ্কার ক্রয়ের ফল কি? সমস্তই ত পিরাণ মধ্যে থাকিবে।" কেন, গলায় চিক দেখা যাইবে, কাণে কাণ শোভা পাইবে, পায়ের মল মধুর ধ্বনি করিতেই থাকিবে, এবং যদি কেহ বুদ্ধিমতী হন, তিনি কৌশল ক্রমে বালা দুই গাছিও দেখাইতে পারিবেন; কেবল দুই চারি খানি অলঙ্কারের জন্য কি লজ্জা ত্যাগ করা ভাল? তবে আমরা ইহা বলিতেছি না যে, দিবা রাত্র পিরাণ গাত্রে দিয়া থাকিতে হইবে, রন্ধন প্রভৃতি কার্য্যের সময় যদি পিরাণ গাত্রে না দিলে সুবিধা হয়, গাত্রে দিবেন না। পল্লী গ্রামের কোন কোন রমণী বলিতে পারেন,"পিরাণ গাত্রে দিলে লোকে নিন্দা করে"—কি করা যাইবে? নিন্দুকের মুখ বন্ধ হইবার নহে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা করিলে লোকে নিন্দা করিত; এক্ষণে আর প্রায় সেরূপ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় না। কালে পিরাণ ব্যবহার জন্যও নিন্দা শুনিতে পাওয়া যাইবে না। কারণ সকলের বাটীতেই পিরাণ ব্যবহার প্রচলিত হইলে কে কাহার নিন্দা করিবে? সম্প্রতি কিছু দিন নিন্দা

সহ্য করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষিতা মহিলারা তাহাতে পশ্চাৎ হটিবেন না। বিশেষতঃ নব্যপুরুষেরা তাঁহাদিগের সহায় থাকিবেন।

স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বশরীর চাদরে মণ্ডিত করিয়া তাঁহাদিগকে জড় প্রতিমা সাজান কর্ত্তব্য কি না, এ বিষয়ের আলোচনা কোন কোন সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা শীতকাল ভিন্ন চাদরের প্রয়োজন দেখি না। কারণ পিরাণ থাকিলে চাদরের কার্য্য উহাতে সাধিত হয়, তবে আর জড়-ভরত সাজাইবার প্রয়োজন কি? সুতরাং চাদরের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। টুপি, মোজা, জুতা প্রভৃতি ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োনীয়। আপাতত পরণের কাপড় খানি মোটা বা রেশমি এবং গায়ে একটী পিরাণ দেখিলেই আমরা যথেষ্ট উন্নতি মনে করিব। আমরা সাধারণ বঙ্গ-মহিলার অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলাম; ধনশালী কুল-কামিনীরা বা উন্নত ব্রাহ্মিকারা কি করেন বা করিবেন, তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে।

বঙ্গীয় বিধবা।

বঙ্গীয় বিধবার ন্যায় হতভাগিনী এ সংসারে আর কেহ নাই। এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় এ জগতে আর কাহা-কেও থাকিতে হয় না। ইঁহাদের ভোজনে তৃপ্তি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। ইঁহারা সতত বিষণ্ণ; সতত গভীর চিন্তায় মগ্ন; চক্ষু কোটরস্থ হইয়াছে, মুখে কালিমা পড়িয়াছে—দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পূর্ব্ব জন্মে যে ইঁহারা কত পাপ করিয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার নির্ণয় করা যায় না।

একটি দশম বর্ষীয়া বালিকা সংসারের সুখ দুঃখে অন-ভিজ্ঞা, সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তাহার এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া হইল। যুবক হয় ত মদ্যপায়ী, নয় ত পর-দার-রত। অল্পকাল মধ্যে স্বভাবের নিয়ম-ভঙ্গ হেতু করাল কাল তাহাকে গ্রহণ করিল, একবার ভাবিলও না যে বালার দশায় কি হইবে! কেবলমাত্র একটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ জলাভাবে সেটী বিশুষ্ক হইতে লাগিল; সমাজ-শাসন সমস্ত বিষয়ে তাহাকে বঞ্চিত করিল; ভাল দ্রব্য সে আর খাইতে পাইবে না, ভাল বস্ত্র সে আর পরিধান করিতে পাইবে না। কোন প্রকার আমোদে রত হইলে তাহার নিন্দা হইবে। ঈশ্বর-দত্ত হাস্য যাহা না থাকিলে এ সংসার বিষাদময় হইত, তাহাতেও সে বঞ্চিত হইল—হাস্য করা তাহার পক্ষে পাপ। দশম বর্ষীয়া

বালিকার পক্ষে এই সকল কঠোর নিয়ম যে কত দূর কষ্ট-দায়ক তাহা ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যত দিন পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বিধবাদিগকে অতি হেয় হইয়া সংসারে থাকিতে হয়। পিতাই বলুন, ভ্রাতাই বলুন, সকলের নিকটেই ভীত চিত্তে থাকিতে হয়। সময়ে সময়ে ভ্রাতৃপত্নী, বা ভগিনীর অথবা পাড়া প্রতিবেশীর হৃদি-দগ্ধকারী উপহাস মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হয়। যিনি বিধবা হইলেন, তিনি জানিলেন যে, সকলের নিকট তিরস্কৃতা হইয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হয় এবং তাঁহাকে সকল ব্যক্তিরই তিরস্কার করিবার অধিকার আছে। দৈবাৎ যদি তিনি কোন একটী দোষ করিয়া ফেলেন, তবে আর তাঁহার নিস্তার নাই; পরিবারস্থ সকলের নিকট এক এক বার তিরস্কার তাঁহাকে খাইতেই হইবে। ফলত এক জনের পোষ্য হইয়া চির-কাল থাকিতে হয় বলিয়া বড় অনাদরে ইঁহাদিগকে জীবন যাপন করিতে হয়। যদিও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে, এক একটি গৃহে এক একটি বিধবা মহিলা কর্ত্রী-স্বরূপা থাকেন, সে অনেক কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগের পর, তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে অনেক কার্য্য পাওয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হন না। কিন্তু সকলের ভাগ্যে আবার সে সুখ টুকুও ঘটে না।

একাদশী বঙ্গদেশে রাক্ষসী তিথী। নিদাঘ কালে যখন আমরা গ্লাস গ্লাস জল পান করি; গৃহ মধ্যে বা গৃহের বাহিরে, নদীর তীরে বা উদ্যানে কোন স্থানেই শান্তি

লাভ করিতে পারি না; রাশি রাশি ডাব ও স্তূপাকার বরফ খাইয়াও আমাদিগের তৃপ্তি হয় না; তখন কত শত বঙ্গীয় বিধবা—বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা—একবিন্দু জলাভাবে হা হা করিতে থাকেন, আর আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, গাত্রে ফুৎকার দিয়া বেড়াই। এমন নির্দ্দয় জাতি ও কঠোর নিয়ম আর কোন দেশে বা কোন স্থানে আছে কি? এই পাপেই আমাদিগের এমন দশা হইতেছে—গৃহে অন্ন থাকিতেছে না, দুর্ভিক্ষে ও জ্বরে লোক নাশ হইতেছে। ইহার প্রতিকার কি কিছুই নাই? কোন প্রকারেই কি আমরা এই প্রথা পরিবর্ত্তিত বা ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? কিন্তু, একেবারে পূর্ব্ব প্রথা উঠাইয়া দেওয়া আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। কেননা, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সকল প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশের উদ্দেশ্য ভাল। একাদশীর প্রথা যে একেবারে মন্দ তাহা বলিতে পারি না। ভাল উদ্দেশ্যেই একাদশীর সৃষ্টি। তবে গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একাদশীর দিবস বিধবাদিগকে গঙ্গাজল খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য শুনিয়া, রামনাম উচ্চারণ করত ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক "ভগবান রক্ষা কর, ঘোর কলি উপস্থিত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহা সহ্য হয় না, ও গোঁড়ামী ভাল লাগে না। আমাদের সামান্য বিবেচনায় একাদশীর দিবস বিধবাদিগকে গঙ্গাজল পান করিতে দিলে পাতক নাই, বরং পুণ্য আছে; আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা দিলে অনায়াসে

তাহা চলিতে পারে, কিন্তু তাহার বিশেষ চেষ্টা চাই; কে সে চেষ্টা করিবে? আমাদিগের মস্তিষ্কে—আমাদিগের ভগিনীর বা ভ্রাতৃপত্নীর এ দুর্দ্দশার চিন্তা প্রবেশ করে কি?

আর তোমাকেও বলি বঙ্গীয় সধবা রমণি! তুমি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াও জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিবে না? তোমার বিধবা ননদিনী যদি একখানি রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী পরিধান করেন, তবে তোমার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না কেন? বিষে-ভরা বক্র-হাসি বাহির হয় কেন? তাঁহার দারুণ মানসিক কষ্ট তুমি কি বুঝিতে পার না? সভ্যতার আগমনে তোমার হৃদয় হইতে কি সহানুভূতি দূর হইয়াছে? যাহাতে সে সুখী হয়, তোমার তাহা করা উচিত, কিন্তু তুমি স্ত্রীজাতি হইয়াও স্বজাতীর সুখ চিন্তা কর না, আমরা পুরুষ হইয়া কি করিব? তুমি মনে করিলে অত দুঃখের মধ্যেও বঙ্গ-বিধবাকে কতক পরিমাণে সুখী করিতে পার; তাহা না করা তোমার মহাপাপ,—আর আমাদিগের পাপের ত সীমা নাই।

বঙ্গীয় সধবা রমণী।

আমাদের বিবেচনায় সে কালের সধবা স্ত্রীলোকেরা এখনকার অনেক সধবা-রমণী অপেক্ষা অধিক সুখ ভোগ করিতেন। কারণ তাঁহারা তৎকালে স্বামীদিগের নিকট হইতে যে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেন, সেই প্রকার ব্যবহারই প্রাপ্ত হইতেন। তৎকালে সধবা রমণীরা জ্ঞানের আলোক সম্যক্ প্রাপ্ত হইতেন না, সুতরাং স্বামীর নিকট হইতে তাঁহাদিগের কি প্রকার ব্যবহার প্রাপ্য ছিল, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের স্বামী তাঁহাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহারই করুন না, তাহাতেই তাঁহাদিগের সন্তুষ্ট থাকা ধর্ম্মত উচিত। সেই জন্য স্বামীর সমস্ত কার্য্যে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। এবং সন্তুষ্ট থাকিতেন বলিয়াই, তাঁহারা এক্ষণকার রমণীদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুখী ছিলেন। কথাটা বড় বিষম এবং অবিশ্বাস যোগ্য, কিন্তু সত্য। বর্ত্তমান সময়ের মহিলারা সে প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিতেও পারেন না। যেহেতু তাঁহাদিগের এক্ষণে অনেকটা জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে। যথার্থ প্রণয় কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন—পূর্ব্বে রমণীরা তাহা বড় বুঝিতেন না; পূর্ব্বে স্বামী ব্যভিচার-রত হইলে স্ত্রী ভাবিতেন, পুরুষের ওরূপ কার্য্যে দোষ নাই। কিন্তু এক্ষণে মহিলারা ভাবেন, যেরূপ তাঁহাদিগের স্বামীর নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া পাপ, স্বামীদিগের সেইরূপ তাঁহাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক হওয়াও পাপ। এইরূপ চিন্তার ফল যে কি হইতেছে, তাহা মনে হইলে আমাদের

আহ্লাদ হয় না। কেননা, এই রূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন বলিয়াই বঙ্গে শত শত রমণী স্বামীদিগের স্বার্থপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া শীর্ণ-কলেবরা ও শুষ্ক-বদনা হইতেছেন।

আবার যুবকগণ অন্যদিকে আরও পাঁচপ্রকার বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া স্ত্রী-দিগকে অসুখী করিতেছেন। যদিও বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে তাঁহাদের স্ত্রীরা সৎব্যবহার প্রাপ্ত হয়েন না। কেহ কেহ স্ত্রীলোকের গাত্রে হস্তোত্তোলন করিতে ও সঙ্কুচিত হন না; ইহাঁদের স্ত্রীরা লজ্জায় ঘৃণায় ম্লান হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন। কোন কোন মহাপুরুষ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কুলকামিনীকে বল পূর্ব্বক গৃহের বাহির করিবার চেষ্টা করেন; কেহ বা স্বীয় ভবনে বারাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে নিশা যাপন করেন—ওদিকে ভবন মধ্যে সর্ব্বগুণসম্পন্না, লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে—মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন।

অনেকে মনে করেন যে, যদিও তাঁহারা স্ত্রীর সহিত সময়ে সময়ে অন্যায় ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ৪০ভরির মল গড়াইয়া দেন এবং ১০০ টাকা দিয়া বেনারশী সাটী কিনিয়া দেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। এটি তাঁহাদিগের মহৎ ভ্রম। বঙ্গ-মহিলা কিঞ্চিৎ অলঙ্কারপ্রিয় হইলেও অকৃত্রিম ভালবাসার পরিবর্ত্তে অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কখন সন্তোষ লাভ করেন না—ইহা আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। কোন কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকাশ্যে

স্ত্রীর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, ইহারা অতিশয় নরাধম।

ফলত বঙ্গীয় সধবা রমণীদিগকে যতদূর সুখী মনে করা যায় ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই বাস্তবিক ততদূর সুখী কিনা সন্দেহ। আমরা অনেক স্থানের অনেক ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া ইহা বলিতেছি। যে সকল ঘটনা আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে কেবল অধিকাংশ সধবা সুখী নহেন এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু তাহাঁরা অতি বড় অসুখী—সাধারণত পুরুষদের অপেক্ষা তাঁহারা অতি অসুখে জীবন যাপন করেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ইহার একটা ব্যবস্থা করা উচিত হইয়াছে। বঙ্গ-মহিলারা মনে করিলেই একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আমরা যে দুই একটী ব্যবস্থা বলিয়া দিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ-পাঠে জানিতে পারিবেন।

স্বামী বশীকরণ মন্ত্র।

সে কালে স্ত্রীলোকেরা স্বামীদিগকে বশ করিবার অনেক প্রকার মন্ত্র তন্ত্র ও তুক্ তাক্ শিক্ষা করিতেন। "রামের মা" "জগার মা" প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের এই সকল মন্ত্র বিদ্যায় বিশেষ রূপ ব্যুৎপত্তি ছিল। যেমনই কেন অবাধ্য স্বামী হউন না, তাঁহার স্ত্রী কোন কৌশলে যদি রামের মার ঔষধ পানের সহিত তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিতেন, আর তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা থাকিত না। কিরণের স্বামী কিরণকে গ্রহণ করে না, তাহার সহিত কথা কহে না—একবার তাহার দিকে তাকায়ও না। কিরণের মাতা কাঁদিয়া অস্থির, পাড়া প্রতিবেশীর ও দুঃখের সীমা নাই। কিরণের মাতা কাঁদিয়া দুঃখের কথা "জগার মা"কে বলিলেন। জগার মা কি তুক্ তাক্ বলিয়া দিল, রাত্রে তাহা করা হইল, প্রাতে কিরণের স্বামী যেন সে মানুষই নয়—একেবারে কিরণের গোলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়—এই প্রকার মন্ত্রাদি এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। সভ্যতার আলোকে রমণীদিগের মানস হইতে ভ্রমান্ধকার দূর হইয়াছে। কিন্তু অবশ স্বামীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা যে হ্রাস হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

আজিকালি কয়েকটা রোগে স্বামীরা আক্রান্ত হন। তন্মধ্যে প্রধান মদ্য-পান। আর তাঁহারা যে উপস্ত্রীর নিকট গমনে বিশেষ ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহাও নহে। সময়ে সময়ে অতি বিদ্বান, জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও এই সকল দুষ্কর্ম্মে রত দেখিয়া, আমরা সাতিশয় ক্ষুব্ধ হই। পরিবার লইয়া বাস

করিতেছেন, সন্তানাদি হইয়াছে, অথচ এক একটি উপ-পরিবার আছে। বাবু সেইখানেই দিবা রাত্রি পড়িয়া থাকেন।

অবশ স্বামীকে বশ করিবার উপায় আছে। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে যে কারণে স্বামীর সহিত স্ত্রীর মনো-মিলন হয় না, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। ইহা সকলেই জানেন যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বভাব ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কাহার স্বভাব গম্ভীর, কাহারও চঞ্চল। কেহ অত্যন্ত আমোদ-প্রিয়, কেহ একেবারে আমোদে বিরত। ইঁহাদিগের স্ত্রীদিগের স্বভাব ও যদি ইঁহাদের মত হয়, তাহাহইলেই উভয়ের মধ্যে বেশ প্রণয় জন্মে। কিন্তু অনেক স্থলে তাহা হয় না বলিয়া, স্ত্রীপুরুষের মনের অমিল হয়। লোকে স্ত্রীবর্ত্তমানেও পরনারীর নিকট গমন করে কেন ? বোধ হয়, বার-বিলাসিনীর নিকট তাহারা যে সকল আমোদ লাভ করে স্ত্রীর নিকট তাহা পায় না বলিয়া। সাধারণত বাঙ্গালি অত্যন্ত বাহ্যিক আড়ম্বর-প্রিয়, কোন বিষয়েই ভিতর বুঝিতে বাঙ্গালি চেষ্টা করে না ; সুতরাং মায়াবিনী বারবিলাসিনী-দিগের মায়ায় ভুলিয়া তাহাদের মায়া-পাশে আবদ্ধ হয় এবং খনি হইতে বহিষ্কৃত স্বর্ণের ও গিল্টি করা পিতলের মুল্যের তারতম্য বুঝিতে পারে না।

এই জন্য আমাদের পরামর্শ এই যে, যে মোহন হাসিতে গুণরাজ মোহিত হয়েন, স্ত্রীকে সেই মোহন হাসি হাসিতে হইবে। যে কথায় তিনি বিরক্ত না হন, সদা সেইরূপ কথা কহিতে হইবে। তাঁহার মনকে এমনি কৌশল করিয়া সর্ব্বদা নিজের প্রতি আকৃষ্ট রাখিতে হইবে, যেন উহা কোন

পাপিয়সীর চিন্তায় রত হইতে না পারে। আমাদিগের মহিলারা স্বামীদের দুর্ম্মতি দূর করিতে চেষ্টা প্রায় করেন না, তাঁহারা স্বামীদের উপর কেবল অভিমান করেন, এ অভিমানের ফল কিছুই হয় না। স্বামীকে বশে রাখিতে হইলে, তাঁহাকে পাপ কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য সর্ব্বদা নানা বিধ চেষ্টা করিতে হয় এবং ধৈর্য্যের সহিত সেই চেষ্টার ফলাফল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

যদি কোন মহিলা স্বামীর মদ্যপান করা নিবারণ করিতে পারেন, তবে তিনি স্ত্রী। কিন্তু আমরা উপরেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদিগের মহিলারা এসকলের প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল স্বামীর উপর অভিমান করিয়া বসিয়া থাকেন। স্বামী মদ্যপান করিয়াছেন শুনিয়া, স্ত্রী মস্তকে করাঘাত করিলেন, ঘণ্টা তিন চারি ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া ক্রন্দন করিলেন; শেষে সমস্ত রাত্রি হয় তো উপবাস করিয়া রহিলেন। আরে বাছা! যার হৃদয় নাই, তার হৃদয় কি ক্রন্দনে গলে? সাত দিন না খাইলেও সে তাহার অনুসন্ধান লইবে কি না সন্দেহ। আমরা বলি, কেবল ক্রোধ পরবশ না হইয়া, দুঃখ অভিমান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তিরস্কার বা কলহ না করিয়া যে সময়ে স্বামী জ্ঞানাবস্থায় থাকেন, সেই সময়ে তাঁহাকে দুই চারিটা কথা উপদেশ স্বরূপ বা প্রার্থনা স্বরূপ বলিলে কিছু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। তখন দুই এক বিন্দু কাঁদিতে পারিলেও ভাল হয়। আমরা দুই চারি জনকে এরূপ করিতে শুনিয়াছি, তাহার ফল মন্দ হয় নাই। যদি এই কারণে স্বামী

ক্রোধ করিয়া তিরস্কার করেন, তবে তাহা বিনা বাক্য-ব্যয়ে সহ্য করা উচিত। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পশ্চাতে লাগিয়া থাকিলে, পরিশেষে ভাল হইবার সম্ভাবনা, যেরূপ পাগলের গালাগালি কেহ গ্রাহ্য করে না, সেইরূপ সময়ে সময়ে এই পাগলদিগের তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। শারদা সুন্দরীর কথা কেবল পুস্তকে পাঠ করিলে হয় না, সেই মত কার্য্য করিতে হয়।

স্বামী বশ করার সম্বন্ধে আর ও কয়েকটি কথা বলিব। যেরূপ বালকে পুত্তলিকা ভাল বাসে, কতকগুলি রমণী তাঁহাদিগের স্বামীগণকে সেইরূপ ভাল বাসেন। তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত স্বামীদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন না। তাঁহারা চাহেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে সর্ব্বদা স্বামীরা উপস্থিত থাকুন। অন্যান্য কার্য্য চলুক বা না চলুক, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত নাই। ইঁহাদের অভিমান কথায় কথায় হয়। এরূপ ভাল বাসা ক্রমে বিরক্তিকর হইয়া উঠে ও শেষে অশান্তির মূল হয়। আর কতকগুলি রমণী আছেন, তাঁহারা ভালবাসার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে চাহেন না, স্বামীদিগকে তাঁহারা অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না। সর্ব্বদা উঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ঐরূপ করিলে স্বামী বশ হয়। এদিকে স্বামীরা মনে করেন, তাঁহাদিগের স্ত্রীরা তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন না, ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কেহ কাহাকেও ভালবাসিতে চাহে না। সুতরাং এই শ্রেণীর স্বামীরা ভ্রমে পতিত হইয়া অপাত্রে ভাল-বাসা ন্যস্ত করেন এবং পরিশেষে দুর্ম্মতি প্রাপ্ত হয়েন। তখন তাঁহাদিগের স্ত্রীরা

দুঃখ করেন। আমরা বলি উল্লিখিত দুই প্রকারের ভাল বাসাই অসম্পূর্ণ ও অনিষ্টের মূল। আমাদিগের বিবেচনায় অতিশয় ভালবাসা দেখাইতে ইচ্ছা হইলেও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সময়ে সময়ে তাহা চাপিয়া রাখিতে হয়। আবার অন্তরে অত্যন্ত ভাল বাসিলেও সময়ে সময়ে উহা প্রকাশ করিতে হয়, এবং কার্য্য দ্বারা স্বামীর মনে প্রতীতি জন্মাইতে হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই, স্বামী বশ করিবার বিশেষ কোন মন্ত্র আর নাই। আপন আপন স্বামীর অন্তঃকরণ বুঝিয়া, সেই মত কার্য্য করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই স্বামী বশ করিবার এক মাত্র মন্ত্র; আমাদিগের মতে ইহা অব্যর্থ, সকলের এক একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না।

দ্বিতীয় গুখ।

গৃহিণী।

যেরূপ দেশ মধ্যে রাজা ও গ্রামের মধ্যে জমীদার, সেইরূপ বঙ্গ-দেশে গৃহস্থ মধ্যে কর্ত্তা বা গৃহিণী। রাজার ও জমীদারের ক্ষমতার সীমা আছে, কেন না তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রজার মত লইয়া কার্য্য করিতে হয়; কর্ত্তার ক্ষমতারও সীমা আছে—কেন না তাঁহাকে সময়ে সময়ে কর্ত্রীকে ভয় করিয়া চলিতে হয়; কিন্তু গৃহিণী বা গিন্নির ক্ষমতার সীমা নাই; তাঁহার অত্যন্ত প্রতাপ। এই কর্ত্রী বা গৃহিণীরা পিসি, মাসি, ঠাকুর-মাতা ও বিধবা দিদিরূপে বঙ্গ-দেশে বিরাজ করিতেছেন এবং প্রত্যেক বাঙ্গালির গৃহ শাসন করিতেছেন। প্রাতঃকালে বালক বালিক্যাদিগকে জল খাবার দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রিতে সকলকে খাওয়ান পর্য্যন্ত, সমস্তই ইঁহাদিগকে করিতে হয় এবং অনেক সময় অনেকে অম্লানবদনে করিয়াও থাকেন। বাস্তবিক ইঁহারা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে বিবাদ কলহ ও বিশৃঙ্খলতা অনেক গৃহেই অবস্থিতি করিত। কিন্তু সকল দ্রব্যেরই ভাল মন্দ আছে। গৃহিণীদের মধ্যেও ভাল মন্দ দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন।

অনর্থক কথা কহা, বিনা প্রয়োজনে তাড়না করা, শিক্ষা না দিয়া কেবল দোষ গুণের সমালোচনা করা, কতক

গুলি গৃহিণীর স্বভাব। এক একটি বাটীতে প্রবেশ করুন, দেখিবেন, গিন্নি অনবরত ঘূরিতেছেন, হস্ত পদের বিরাম নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলিতেছে—কখন ছেলেদিগকে বকিতেছেন, কখন মেয়েদিগকে তাড়না করিতেছেন, কখনও বধূদিগের উপর গর্জ্জন করিতেছেন। ছেলের অপরাধ হয় ত এক ঘটী জল ফেলিয়া দেওয়া, মেয়ের অপরাধ তাহাকে নিবারণ না করা এবং বধূর অপরাধ বগুনার কালি সম্পূর্ণ তুলিতে না পারা। এই সকল সামান্য সামান্য অপরাধে পরিবারস্থ সকলকেই প্রায় গৃহিণী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতে হয়। তন্মধ্যে বধূদিগের প্রতি শাসন কিছু কঠোর। অনেক বধূরই গৃহিণীর তাড়নার ভয়ে পেটের ভাত চাল্ হইয়া যায়।

কতকগুলি গৃহিণী আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সকলের ছলান্বেষণ করিয়া থাকেন এবং একটু মাত্র ছল পাইলেই একেবারে অগ্নিমুখী হইয়া বসেন। বিনা প্রয়োজনে তিরস্কার করা, ইঁহাদিগের অভ্যাস। যে সময়ে তিরস্কার না করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত, সে সময়ে ইঁহারা কেবল তিরস্কার করিয়া থাকেন ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা বড় বিষম ব্যাপার।

আর কতকগুলি গৃহিণী আছেন, ইঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া সকলকে কার্য্য করিতে হয়। তাঁহারা কোন কার্য্য করিতে বলিবেন না, অথচ না করিলে তজ্জন্য তিরস্কার বা নিন্দা করিতে ছাড়িবেন না। ইহারা অধিকাংশ সময়েই অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই অভিমান অতি ভয়ানক, বস্তুত ইহা তিরস্কার অপেক্ষা শতগুণে কষ্টদায়ক। যাঁহারা এইরূপ তিরস্কার বা অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের

অন্তঃকরণ কুটিলতা পূর্ণ; তাঁহাদের জন্য গৃহে সুখ থাকে না, সর্ব্বদাই সকলকে ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়। কিসে ইহারা তুষ্ট হইবেন জানিতে না পারায়, কেহই ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না—ইঁহারা কখন সন্তুষ্ট হন না।

সর্ব্বদা তিরস্কার করার ফল যে বিষময়, তাহা অনেক গৃহিণীতে বুঝেন না। তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইয়া অনেক বধূ পরিশেষে মুখরা হইয়া পড়েন। একদিন দুই দিন গালি খাইতে খাইতে ক্রমে ইঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হন; তখন ইঁহারাও কোমর বাঁধিয়া বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যে শাশুড়ি বা পিশাশকে পরাস্ত করিয়া ফেলেন। ইঁহারা এই খানেই যদি ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে অনেক মঙ্গল হইত। বধূ কিন্তু তাহা না থাকিয়া আপনাদের অধীনস্থ বধূদিগের উপর তাড়না আরম্ভ করেন। যদি এই সময়ে দৈবানুগ্রহে পুরাতন গৃহিণী অর্থাৎ শাশুড়ি, ননদ, বা পিশাশ মনুষ্য জীবনের নশ্বরতা প্রমাণ করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অমনি "প্রবল প্রতাপ "গৃহিণী হইয়া পড়েন। এইরূপে গৃহিণীত্ব পুরুষানুক্রমে বঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। আমরা উপরে বলিয়াছি যে, অনেক গৃহিণীর দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে অনেক সংসার চলিতেছে, সকল গৃহেই গৃহিণী থাকা আমাদের মতে ভাল; কিন্তু কতকগুলি গৃহিণীর কার্য্য কলাপের উন্নতি হওয়া আবশ্যক। ভাল গৃহিণী যেরূপ সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপা, দুর্ম্মুখা গৃহিণী সেইরূপ সকল অনিষ্টের মূল।

যিনি গৃহিণী তাঁহার গম্ভীর হওয়া উচিত—গম্ভীর না

হইলে গৃহিণী হইতে পারা যায় না। তাঁহাকে পৃথিবীর ন্যায় সহ্য-গুণবিশিষ্টা হইতে হইবে, তাঁহার ক্রোধ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় থাকিবে ; কখন প্রকাশ পাইবে না—অনেক সময় মনের ক্রোধ মনেই বিলীন হইবে। সংসারের অর্দ্ধেক কথা তিনি শুনিবেন,অর্দ্ধেক শুনিয়াও শুনিবেন না। সকলের দোষ গোপন করা তাঁহার একটি কার্য্য। ক্ষমা তাঁহাকে সহস্রবার করিতে হইবে, অভিমান তাঁহার শরীরে একেবারে থাকিবে না, সকলের সহিত তাঁহাকে সমান ব্যবহার করিতে হইবে—এক চোকী হওয়া বড় দোষ। যদি কেহ গৃহিণীর কোন কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কোন কটু কথা বলে, তাহা হইলে সেটা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। মোট কথা, গৃহিণী একজন সরল-হৃদয়া, আত্মাভিমান-শূন্যা, কার্য্য-কুশলা, মিষ্ট-ভাষিণী, ক্রোধ-বিহীনা, স্ত্রীলোক হওয়া চাই। যাঁহার উপর সংসারের ভার পড়িবে, তাঁহার মন উচ্চ-দরের হওয়া আবশ্যক। যে গৃহের এইরূপ গৃহিণী, তথায় সুখ-সচ্ছন্দতা সতত বিরাজ করে।

গৃহিণীগণের গৃহকার্য্য করা চাই।

কেবল পুস্তক-পাঠই কি স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য? আমাদের বিবেচনায় কেবল পুস্তক-পাঠই স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য নহে, তাঁহাদিগের আরও অনেক কার্য্য আছে। বর্ত্তমান সময়ে পুস্তক-পাঠের প্রতি স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কার্য্যের প্রতি সেইরূপ অবজ্ঞাও লক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গার্হস্থ্য সমস্ত কার্য্যই পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হইত, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাদের হস্তের বিরাম থাকিত না। আর এক্ষণেত সে হিসাবে রমণারা প্রায় কিছুই করেন না। আমাদিগের দেশের পুরুষদিগের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের যেরূপ হ্রাস হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও তদ্রূপ হইয়াছে। এ লক্ষণ ভাল নহে। সে কালের একজন পক্বকেশা, দন্ত-বিহীনা, রমণী অনায়াসে চারি পাচ হাঁড়ি ভাত রাঁধিয়া চল্লিশ, পঞ্চাশ জনকে খাওয়াইতে পারেন, কিন্তু আধুনিক একজন কণ্ঠগতা-কাদম্বরী বা মজ্জাগতা তিলোত্তমা রমণী এক হাঁড়ি ভাত রাঁধিয়া স্বামী বা দেবরকে ভোজন করান, মহা কষ্টকর জ্ঞান করেন, ফলত আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া আসিতেছি, শারীরিক পরিশ্রম বঙ্গবাসীর গৃহ হইতে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। কেবল পুস্তক-পাঠে সময় অতিবাহিত না করিয়া, সময়কে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগে এক একটী কার্য্য করা কর্ত্তব্য, এ কথা আমরা আগেই বলিয়া আসিয়াছি।

রন্ধন স্ত্রীলোকের একটি প্রধান কার্য্য। রন্ধনে তাচ্ছিল্য করা কোন মতেই উচিত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় পূর্ব্বের মত পাকা রাঁধুনী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণকার বাবুরা প্রায়ই পাচক ব্রাহ্মণ ও পাচিকা ব্রাহ্মণী রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গৃহিণীদের রন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই। গৃহিণীর হস্তের প্রস্তুত খাস্তার কচুরি বা মুড়র ঘণ্ট খাইতে কাহার না অভিলাষ হয়? কিন্তু রন্ধন কার্য্যের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্য দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হয়, আর দশ বা পনের বৎসর পরে আমাদিগের মহিলারা একেবারে রন্ধনকার্য্য ভুলিয়া যাইবেন।

গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা আর একটি অতি আবশ্যকীয় কার্য্য। এ বিষয়েরও আজি কালি কিয়ৎ পরিমাণে তাচ্ছিল্য লক্ষিত হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সকলেই কিছু ক্ষমতাবান হয় না, সকলেই উপার্জ্জন করে না, যাঁহার স্বামী উপার্জ্জন করেন, তিনিই গৃহিণী। তাঁহার উচিত সকলের, বিশেষ গুরুজনদিগের সেবা শুশ্রূষা করা; তাঁহারা আহারাদি করিলেন কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ করা। কোন কোন গৃহে এরূপ দৃষ্ট হয়, বেলা দুই প্রহরের সময় শাশুড়ি বা পিশাশ দূরে পাকশালায় আহার করিতেছেন, আর বধূঠাকুরাণী নিজ গৃহে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন, একবার অনুসন্ধান করিতেছেন না, যে, ইহাদিগের রীতিমত আহারাদি হইতেছে কি না। এমন কি, অনেকে নিজের ও স্বামীর উদর ভিন্ন আর কিছুই বুঝেন না। ইহা বড়

প্রশংসনীয় নহে। এই দোষেই প্রায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ দিন দিন হ্রাস পাইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যেমন সমান ভাবে সকলকে দেখা হইত এক্ষণে আর তেমন হয় না। এতৎ সম্বন্ধে আমরা একটি স্থানের এক ঘর গৃহস্থের গল্প বলিব। এক গ্রামে তিন ঘর জ্ঞাতি ছিলেন; এই তিন ঘরের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কর্ত্রী স্বরূপা ছিলেন, তিনিই তিন বাটী শাসন করিতেন। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্যই হইত না। যদি দৈবাৎ কোন দিন কোন কুটুম্ব কোন বাটীতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনবাটী হইতে ব্যঞ্জনাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে অতি পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হইত। তাঁহার আর একটি বিশেষ আদেশ ছিল যে, প্রতি বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন ও ডাল প্রস্তুত হইবে। ভোজনের সময় তিন বাটীর ডাল ও ব্যঞ্জন একত্রিত করিয়া সকলে মিলিয়া মহানন্দে ভোজন করিতেন। প্রত্যহই তিন চারি প্রকারের ব্যঞ্জন ও ডাল ভোজন করা হইত, অথচ এক বাটীতে সমস্ত প্রস্তুত হইত না। এরূপ একতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্ত্রীলোকও আর নাই। এখন সব "আড় আড়, ছাড় ছাড়"।

গৃহের অন্যান্য তত্ত্বাবধারণ করা আর এক কার্য্য। অনেক নব গৃহিণীর অলসতা জন্য তাঁহাদের স্বামীর উপর লক্ষ্মীর কৃপা হয় না। যাহা আয় তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। অর্দ্ধেক দ্রব্যই চাকরাণীতে চুরি করিয়া লয়। স্বামীর আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখা মহাপাপ, ইহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত।

উপরোক্ত কার্য্য কয়েকটি ভিন্ন আরও অনেক কার্য্য আছে। সে কালের স্ত্রীলোকেরা সময় ভাগ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা কেবল গৃহকার্য্য করিতেন। একালের স্ত্রীলোকেরাও যদি কেবল এক বিষয়েই মন দেন, তাহা হইলে সুশিক্ষার ফল কি হইল ?

বঙ্গমহিলার সন্তানাদি লালন পালনের কথা।

সন্তান লালন পালন করা বড় কঠিন কার্য্য। আমাদের দেশে মাতা পিতার দোষে যে কত শিশু অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে যদিও এখন অপেক্ষা লোকেরা বেশী অজ্ঞ ছিল, কিন্তু, এখন অপেক্ষা দেশের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর থাকায় অনেক রক্ষা ছিল; তথাপি অনেক শিশুর অকালে মৃত্যু হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আজি কালি অনেকের এ বিষয়ে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। সুশিক্ষিতা মহিলারাও এ বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও যে সমস্ত বঙ্গ-দেশের নর-নারীরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন,—এখনও যে তাঁহাদিগের কিছু মাত্র আলস্য বা অসাবধানতা নাই—ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। সন্তানাদির পীড়ার লক্ষণ জানিতে পারা বা, উহা নির্ণয় করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করা মাতা পিতার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু যাহাতে পীড়া না হইতে পারে তাহার প্রতিবিধান তাঁহারা অনায়াসে করিতে পারেন। শৈশবে পিতা অপেক্ষা মাতার যত্নের উপর শিশুদিগের স্বাস্থ্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। অতএব মাতাদিগের এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সাধারণত বঙ্গ-দেশের স্ত্রীলোকদিগকে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলা ও বধিরকে হরিনাম শ্রবণ করান দুই

তুল্য। ছেলের পীড়াই হউক, আর নাই হউক, বঙ্গ-মহিলা কখন নিজের অভ্যাস ত্যাগ করিবেন না ;—তা পুরুষেরা যতই কেন তিরস্কার করুন না। ছেলেটির অসুখ হইয়াছে,—ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিয়া হাঁচিতেছে, খক্ খক্ করিয়া কাসিতেছে, গল্ গল্ করিয়া দুগ্ধ তুলিতেছে, অনবরত মলত্যাগ করিতেছে, মাতার হুঁস নাই। তিনি পান্তভাত খাইবেন, দিবসে নিদ্রা যাইবেন, ছেলেকে ঠাণ্ডা দুগ্ধ খাওয়াইবেন, ও তাহার গাত্র খালি রাখিবেন—ইহাতেও যে ছেলে বাঁচে, সে কেবল ঈশ্বর কৃপায়। সন্তান লালন পালন করা মাতার কর্ত্তব্য কার্য্য, অনুগ্রহ নহে। তাঁহার পান্তভাত খাওয়ায় বা অসময়ে স্নান করায় বা অসময়ে অধিক পরিমাণে অম্ল খাওয়ায়, যদি সন্তানের পীড়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহার অবশ্যই পাপ হইয়া থাকে। যেরূপ পিতার সন্তানের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখা ও সন্তানের পিতার সেবা না করা পাপ, সেইরূপ মাতার সন্তানের শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য করাও পাপ। একটু ঠাণ্ডা দুগ্ধ খাওয়াইতে যে সময় লাগে, একটু গরম দুগ্ধ খাওয়াইতে তাহা অপেক্ষা জোর দশ মিনিট সময় অধিক লাগে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অনেক রমণীর এই দশ মিনিট কালও ধৈর্য্য থাকে না। বরফের মত ঠাণ্ডা দুগ্ধ অনায়াসে ছেলেকে খাওইয়া থাকেন। যাহাই কিছু খাওয়ান হউক না, সেটি নিয়মিত সময়ে খাওয়াইলে ভাল হয় ; তাহা হইবে না। যখন যাঁহার অবকাশ হইবে, তখন তিনি আপন সন্তানকে খাও-

ইয়া কার্য্য সারিয়া লইবেন। কোন দিন বেলা দশটার সময় ছেলেকে দুগ্ধ খাওয়ান হইল; কোন দিন বারটার সময় তাহার উদরে দুগ্ধ পড়িল; আবার কোন দিন একটার সময়েও তাহার ভাগ্যে দুগ্ধ জুটিল না। কোন দিন সন্ধ্যার সময় দুগ্ধ জুটিল; কোন দিন বা রাত্রি দশটার সময় ঘুমন্ত অবস্থায় খানিকটা দুগ্ধ তাহাকে গিলাইয়া দেওয়া হইল। এমন অবস্থায় বঙ্গ-দেশে "ধাত্রী শিক্ষার" জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।

অনেক রমণী প্রশংসা পাইবার জন্য ছেলের প্রতি অযত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ছেলেদের আহা-রাদি ও আপনাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিনা প্রয়োজনে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এই প্রকার পরিশ্রম করায় লাভ আছে, ইহাতে বাটীর বৃদ্ধারা বড় তুষ্ট হন ও পাড়া প্রতিবেশিনীরা বলে, "মাগো, দেখ, সেনেদের সেজো বৌয়ের মত এমন মেহনতি বৌ আর এ দেশে নাই, দিন রাত্ খাট্‌চে, এক বিন্দু জল সমস্ত দিনে পেটে পড়ে না; ছেলেটা ককিয়ে সারা হলেও মাই দেয় না।" বৌয়ের আহ্লাদ আর ধরে না। ঝুপ্ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; সেজো বৌ ভিজিতে ভিজিতে জল আনিতে লাগিলেন, বাড়ীতে সুখ্যাতি ধরে না— "এমন বৌ হবার নয়।" তার তিন দিন পরে ছেলেটি সর্দ্দিতে হাঁস ফাঁস করিতে লাগিল। যে দেশে শারীরিক সুস্থতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দেশে সহস্র প্রকারের "শরীর পালনের" সৃষ্টি হইলেও কাহারও শরীর-পালনে দৃষ্টিপাত হইবে না।

আর এক কারণে শিশুদিগের পীড়া হইয়া থাকে। তাহা অত্যধিক আদর প্রদানে। ছেলের খুড়ি ভাবেন, ছেলেকে একটি রসগোল্লা না খাওয়াইলে তাহার অনাদর করা হয়। তিনি রসগোল্লা খাইতে দিলেন। পিশীমা দেখিলেন, তিনি যদি কিছু খাইতে না দেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে ভাল বলিবে না—তিনি সন্দেশ দিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে আদরোৎপন্ন মিষ্টান্ন খাইয়া ছেলেরা পেটের পীড়ায় অস্থির হয়। এরূপ আদর না করিলেই মঙ্গল হয়। এই আদরে যে শিশুদিগের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়, তাহা যাঁহারা আদর করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

বাল্যকাল হইতে সন্তানদিগকে একটু শাসনে রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহারা বাল্যকাল হইতে শিষ্ট, বাধ্য, সভ্য ও মিষ্টভাষী হয়, মাতার তৎপক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। ছেলে যাহা করিতে জেদ করিবে, যদি অন্যায় হয়, মাতার তাহার বিপরীত করা বিধেয়, তাহা হইলে আর সে কখন জেদ করিবে না—এইরূপ সমস্ত কার্য্যে। ছেলেকে সময়ে সময়ে তিরস্কার, কদাচিৎ অল্প প্রহার ও নিয়ত চক্ষের উপর রাখা আবশ্যক। অনেকে যখন প্রহার করেন, তখন অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত প্রহার করেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চতুর্গুণ আদর দেন। ইহার ফল বিপরীত হইয়া থাকে। শিশুদিগের ক্রন্দন নিবারণার্থ আমাদিগের রমণীরা "জুজু" "পেচো" প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। শৈশব কাল হইতে মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় ছেলেরা অত্যন্ত সাহস-হীন

হইয়া পড়ে ; উক্ত প্রকারে ভয় দেখান কদাচ উচিত নহে।

প্রার্থনা, শিক্ষিতা বঙ্গ মহিলারা সন্তানাদির লালন পালনে বিশেষ মনোযোগ দিবেন। তাঁহারা মনোযোগ দিলে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা অতি দুর্ব্বল, চিররুগ্ন ও সাহস-হীন হয় না, অথবা অশিষ্ট আচরণ দ্বারা সকলকে বিরক্ত করে না। অনেকে বলেন, যদি আমাদিগের সন্তানেরা বালক-কাল হইতে নিয়ম মত প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে অস্থিপঞ্জর-সার নর-নারীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়—গোড়ায় পাকা গাঁথনি হইলে সামান্য ঝড়ে ইষ্টকালয়ের কিছুই করিতে পারে না। বঙ্গ-মহিলারা সামান্য যত্ন করিলেই শৈশব কাল হইতে শিশুরা হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ ও সুশিক্ষিত হয় ; এই সামান্য একটু যত্ন করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে বাধিত করিবেন না কি ?

বঙ্গমহিলার সংসারযাত্রায় সহায়তা।

মহিলাদিগের নিকট হইতে যে সকল বিষয়ে আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহার মধ্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হই, তাহাই প্রধান। তাঁহারা আমাদিগের সুখ দুঃখের ভার সমান অংশে গ্রহণ করিয়া অনেক সময়ে আমাদিগের সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ে সাহায্য করিতে যে পরিমাণে বিজ্ঞতার আবশ্যক ও বুদ্ধির প্রয়োজন, বর্ত্তমান সময়ে অনেক রমণীর সে প্রকার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি নাই; ইহার প্রধান কারণ বাল্যকাল হইতে তাঁহারা এ বিষয়ে রীতিমত শিক্ষিতা হন না।

রমণীদিগের অপেক্ষা পুরুষদিগের অবকাশ অল্প বলিয়া গৃহ সংসারের সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার রমণীদিগকেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা। যে সংসারে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়, তথায় কমলা অধিক দিন থাকেন না। অতি দুঃখের কথা যে, আমাদিগের অনেক রমণী এই কথা বুঝেন না। তাঁহারা সকল বিষয়ের দায়িত্ব স্বামীদিগের মস্তকে অর্পণ করিয়া নিজেরা দোষ হইতে মুক্ত হন। যাঁহার স্বামী বিশ টাকা বেতন পান, হিসাব মত তাঁহার ষোল টাকায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বাকী টাকা কয়েকটি সঞ্চিত করা উচিত, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যদি টীনের পেটরা ও উলের বাক্স ক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা কয়েকটি ব্যয় করিয়া ফেলেন,

তাহা হইলে তাঁহার কি বুদ্ধির কার্য্য করা হয়? সকলের সহিত "টক্কর" দিতে যাইয়া অনেক রমণী বড় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কাহারও প্রতিবেশিনীর স্বামী পঞ্চাশ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার স্বামী ত্রিশ টাকার বেশী বেতন প্রাপ্ত হন না; প্রতিবেশিনী যদি এক টাকার আম্র ক্রয় করেন, তবে তিনিও এক টাকার আম্র ক্রয় করিবেন; প্রতিবেশিনী যদি দেড় টাকার রোহিত মৎস্য ক্রয় করেন, তবে তিনিও তাহাই করিবেন—একবার দেখিবেন না যে, তাঁহার আয় এবং প্রতিবেশিনীর আয় সমান কি না। ইহা সত্য বটে, নিজ ইচ্ছায় কেহ কাহারও অপেক্ষা আপনাকে হীন স্বীকার করিতে চায় না এবং সকলেই উচ্চ হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইতে হইবে, এমন কি কথা? তুমি রাজ্ঞী তোমার ঘরে; আমি রাজ্ঞী আমার ঘরে; তুমি পাঁচ শত টাকায় তোমাকে যে পরিমাণে সুখী জ্ঞান কর, আমি পঞ্চাশ টাকায় আপনাকে তদপেক্ষা কম সুখী জ্ঞান করি না—এইরূপ ভাবিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হয়। কিন্তু এরূপ করিয়া সংসার চালাইতে ইচ্ছা করিলে মনকে অতিশয় দৃঢ় করিতে হয়, লোকের মতামতের উপর সময়ে সময়ে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে হয় এবং লোকের সকল কথায় কর্ণপাত করিলে চলে না। লোকে কৃপণ বলিবে বা দরিদ্র বলিবে বলিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা, বা লোকে বিদ্রূপ করিবে বলিয়া অবস্থা অনুসারে না চলা—অতি অসার বুদ্ধির কর্ম্ম। যিনি আয় অপেক্ষা ব্যয়

অল্প করিবেন, তিনি বুদ্ধিমতী; যিনি আয়ের সমান ব্যয় করিবেন, তিনি বুদ্ধি-হীনা, কিন্তু যিনি আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিবেন, তিনি অতিশয় বুদ্ধি-হীনা।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কালে বঙ্গ-মহিলাদিগকে অনেক সময়ে মন্ত্রীর কার্য্য করিতে হয়। ইহা চির-প্রথিত। উপ-কথায় শুনা গিয়াছে—রাজার সভায় এক বিষম সমস্যা উপ-স্থিত হইল (উপন্যাসের রাজারা প্রায়ই নির্ব্বোধ); রাজা মন্ত্রীকে উহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন; যেমন রাজা তেমনি মন্ত্রী; মন্ত্রী উত্তর দিতে না পারিয়া সময় চাহিলেন, পরে বাটীতে আসিয়া গাত্রে লেপ দিয়া শয়ন করিলেন। মন্ত্রী-পত্নী স্বামীকে অসময়ে লেপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অবগত হইয়া বলি-লেন "ভয় কি, ভাত খাও, আমি সমস্যা পূরণ করিয়া দিব।" পরে সমস্যা পূরণ হইল, মন্ত্রীর মান থাকিল ইত্যাদি। বাস্ত-বিক অনেক সময়ই আমাদিগকে রমণীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। কত সময়ে যে এই পরামর্শ নানা অসুখের মূল হয়, তাহা বলা যায় না। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ, মাতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করণ, পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় কষ্ট দেওয়া—এই প্রকার পরামর্শ সম্ভূত। যাঁহারা পরামর্শ দেন, তাঁহাদের মন যদি হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ না থাকে, জ্ঞানের আলোক যদি তাঁহারা প্রাপ্ত হন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যদি তাঁহাদের প্রবল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দেওয়া পরামর্শের ফল অমৃতময় ও তাঁহাদিগের স্বামিগণের জীবন সুখময় হইয়া উঠে। আর তাঁহারাও আজীবন সুখ সচ্ছন্দে

মনের আনন্দে দিন যাপন করিয়া লক্ষ্মীর স্বরূপা বলিয়া পূজনীয়া হন। প্রত্যেক রমণীর স্বামীকে পরামর্শ দিয়া এইরূপে স্মরণীয়া হইতে যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য।

সুচারুরূপে সংসার চালাইতে হইলে আর একটি বিষয়ে মহিলাদিগের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। পরিচারক ও ও পরিচারিকাদিগের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহারা আমাদিগের এক প্রকার অনুগত; অনুগতের প্রতি অসদ্‌ব্যবহার ধর্ম্ম-গর্হিত। দ্বিতীয়ত চাকর চাকরাণীর প্রতি কুব্যবহার করায় গৃহস্থের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। যে গৃহের গৃহিণী সর্ব্বদা চাকর চাকরাণীদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকেন, এক পয়সার হিসাব তিনবার গ্রহণ করেন, আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, সে গৃহের চাকর চাকরাণীরা অত্যন্ত চোর হয়। তাহাদের সে সংসারের প্রতি মায়া মমতা থাকে না, সুতরাং তাহারা অবাধে পরের দ্রব্য 'লোষ্ট্রবৎ' জ্ঞান করিয়া থাকে। চাকর চাকরাণীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিলে তাহারা অতি দুঃখের অবস্থায়ও পরিত্যাগ করে না—দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। সার্ ওয়াল্টর স্কট্ নামক বিখ্যাত ইংরাজি উপাখ্যান লেখক একেবারে বড় ধনী হন, কিন্তু ধনী লোকেরা সচরাচর ভৃত্যাদির প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে, তিনি সেরূপ করিতেন না—তাহাদিগকে আপনার ন্যায় দেখিতেন। কালক্রমে যখন তিনি দরিদ্র হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার ভৃত্যেরা অর্দ্ধেক বেতনে ও অতি কষ্টে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়াছিল; কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। শুনা যায়

দুঃখের অবস্থায় তাহারা আপনাদিগকে বেশী সুখী জ্ঞান করিত। চাকর চাকরাণীর সহিত উত্তম ব্যবহার না করিলে লক্ষ্মীর শ্রী হয় না। কেবল চাকর চাকরাণী নহে, সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করা উচিত।

যাহা বলিলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—আয় ব্যয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, স্বামীদিগকে যথাসাধ্য সৎ উপদেশ দিয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে, ভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া চুরি প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে, ন্যায়-পথে থাকিয়া কৌশলে সংসার চালাইয়া সুখী হইতে হইবে এবং আমাদিগের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্গমহিলার আচার অনাচারের কথা।

আমাদিগের দেশ-প্রচলিত পুরাতন রীতি নীতির অনেক গুলি অতীব হিতকারী। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতা-প্রযুক্ত সেই সকলের যথার্থ উদ্দেশ্য কি তাহা প্রায়ই জানিতে পারেন না। আচার ও অনাচার অভিধেয় দুইটি শব্দ আমাদিগের দেশের মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। গৃহের প্রাঙ্গনে যদু বেণে ভাত খাইয়া গিয়াছে; সে স্থানে কিন্তু ভাত খাওয়ার চিহ্ন মাত্র নাই। দৈবাৎ গিরিবালা সেই স্থানের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু পদ ধুইলেন না—বাটীর বৃদ্ধা গৃহিণীর মতে তাঁহার তুল্য "অনাচারী" স্ত্রীলোক জগতে নাই। দীনতারিণীর বস্ত্র গোপবধূর পরিষ্কার বস্ত্রে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাঁহার উচিত তৎক্ষণাৎ কাপড় কাচিয়া ফেলা, নতুবা তিনি শুদ্ধ হইলেন না। হেমাঙ্গিনী স্নান করিয়া আসিতেছেন, পথে হরি দুলের বধূর সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দশ হস্ত অন্তরে গেল, কিন্তু তথাপি তাঁহার সন্দেহ হইল, দুলে বৌয়ের বস্ত্র তাঁহার গাত্রে লাগিয়াছে। তিনি পুষ্করিণীতে যাইয়া স্নান করিলেন, পরে দ্রুত পদে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? পথিমধ্যে সন্দেহজনক স্থানে একটা সন্দেহজনক পদার্থ তাঁহার পদে ঠেকিল; অগত্যা তিনি পুনরায় স্নান করিলেন—গ্রামে প্রকাশ হেমাঙ্গিনীর ন্যায় আচার কেহ জানেও না, জানিবেও না। তাহাতেই

আমরা বলিতেছিলাম আমাদের মহিলারা পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার উদ্দেশ্য অনেকে অবগত না হইয়া অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলও যে বড় উৎকৃষ্ট হয়, ইহা আমরা বলিতে পারি না, বরং সময়ে সময়ে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল হয়!

আচার ও অনাচার শব্দের অর্থ কি? আমাদিগের বোধ হয়,সে কালের লোকেরা যে সকল রীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "আচার" নামে এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে; যেমন ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি। যিনি সেই সকল রীতি অনুসারে কার্য্য করেন, বৃদ্ধাদিগের মতে তাঁহার আচার ভাল, যিনি তাহা না করেন, তাঁহার মন্দ। কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই সকল কার্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা করিতেন, তাহা স্বাস্থ্য-রক্ষা। আচার কেবল স্বাস্থ্যের নিমিত্ত,ধর্ম্মের নিমিত্ত নহে। মুখ প্রক্ষালন না করিলে কোন অধর্ম্ম হয় না, কিন্তু প্রক্ষালন করিলে শরীর ভাল থাকে। পায়ুক্ষালন-গৃহ হইতে আসিয়া পদ ধৌত করা বা কোন অপরিষ্কার দ্রব্য-স্পর্শে হস্ত প্রক্ষালন করা,—সকলেরই উদ্দেশ্য শরীর সুস্থ রাখা,—ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। বৃদ্ধা গৃহিণী অবশ্য বিশ্বাস করেন, অনাচারে লক্ষ্মী গৃহ হইতে পলায়ন করেন। সুশিক্ষিতা নব্য মহিলারা যে ইহা বিশ্বাস করেন, এমন আমাদের বিশ্বাস হয় না। মোট কথা আচারের অর্থ পরিষ্কার; অনাচারের অর্থ অপরিষ্কার; নবীনা মহিলারা এই অর্থে এই দুই শব্দ ব্যবহার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

আচারের দিকে অধিক মন দেওয়ার ফল ভাল মন্দ দুই হইয়া থাকে। ভাল এই জন্য যে, ইহাতে স্ত্রীলোকদিগকে অনেক পরিমাণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। মন্দ কেন না— ইহাতে গৃহ-কার্য্যের অনেক অসুবিধা জন্মে। বিধবাদিগকে সধবাদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয়। এমন কি, দশ জন পরিবার থাকিতেও দুই এক জনকে অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়—বাকী কয়েক জনে পবিত্র নহেন বলিয়া কার্য্য করিতে পান না। মনে করুন, একটি গৃহে পাঁচটি বধূ আছেন। পাঁচ জনের পাঁচটি ছেলে আছে। প্রাতে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে বাটীর কৃষাণ, রাখাল, ঝি প্রভৃতি জল খাবার চাহিল, এই পাঁচটি বধূর জলখাবার দিবার ক্ষমতা নাই, কেন না তাঁহারা যে বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে পুত্রেরা প্রস্রাব করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা স্নান না করিলে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে পাইবেন না। এই জন্য প্রাতের প্রায় সমস্ত কার্য্যই হয় ত একজন বিধবাকে করিতে হইল—ইহাতে কত অসুবিধা, তাহা যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারাই জানেন। আর হেমাঙ্গিনীর মত আচার করিতে হইলে—কেবল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এমন নহে, অল্প কাল মধ্যে পীড়াগ্রস্তও হইতে হয়।

আজি কালি রমণীদিগের আচারের প্রতি বড় একটা অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা আচার না করিলে অধর্ম্ম হয়, ইহা না মানিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, আচারের উদ্দেশ্য যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, তাহাও তাঁহারা ক্রমশঃ বিস্মৃত হই-

তেছেন। কোন কোন ভদ্র ঘরের মহিলারা এরূপ অপরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করেন, যে তাহা দেখিলে ঘৃণা বোধ হয়। ছেলে বিছানায় মূত্রত্যাগ করিলে, সেই সকল বিছানা জলে ধৌত করা কর্ত্তব্য, তাহাতে পীড়াদি হইতে পারে না, অথচ আচার রক্ষাও হয়। অনেকে আজি কালি বিছানা ধৌত না করিয়া তাহার উপরেই শিশু দিগকে শয়ন করান। কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে ছেলেদের বিছানা রৌদ্রে দেন। তাহাতে এক দিকে সম্পূর্ণ আচার প্রকাশ পায় না, অন্যদিকে মূত্র জনিত দুর্গন্ধ বিছানা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়ায় সন্তান গণের পীড়া হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে স্বাস্থ্যের সহিত আচারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মহিলারা আবশ্যক মত আচার দেখাইলে কেবল যে বৃদ্ধাদিগের প্রিয় হন, তাহা নহে, তাঁহা-দিগের অন্যবিধ উপকার ও হয়। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে আচারের প্রতি গোঁড়ামী যাউক, কিন্তু আচারের মূল উদ্দেশ্য যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন—কেবল আচার অনাচার বলিয়া নহে, পূর্ব্ব প্রচলিত সকল প্রথাগুলির প্রতি এইরূপ বলা যাইতে পারে।

যাহা বলিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই—আচারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া কার্য্য করিলে উপকার আছে; তবে আচার অনাচার বলিয়া দুইটি শব্দ থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখনকার মহিলারা আচারের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যাহাতে তাহা না হয়, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

বঙ্গমহিলা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন ?

ধর্ম্মের চর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। আধুনিক সুশিক্ষিত যুবকেরা যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা স্থির করা যায় না। মুসলমান খৃষ্টিয়ান সকল জাতিরই ঈশ্বর উপাসনার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে এবং অনেকে নিয়ম মত ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগেরও যে এই রূপ ছিল না এমন নহে, কিন্তু আমরা এক্ষণে মাসান্তেও এক দিন ঈশ্বরের নাম লই কি না সন্দেহ; আমাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগের সহধর্ম্মিণীরা যে ধর্ম্মের আলোচনা পরিত্যাগ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষত এক্ষণে বঙ্গ-মহিলারা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন ? পুরুষেরা তো কখন ব্রাহ্ম, কখন খৃষ্টিয়ান, কখন হিন্দু হন—মহিলারাও কি তাহাই হইবেন ? আমাদের মতে তাঁহারা নামে কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী না হইলেও তাদৃশ ক্ষতি নাই; কেবল সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত সার বিষয় গুলি মনে রাখিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হয়।

সত্য কথা বলা একটি প্রধান ধর্ম্ম; অনেক রমণী ভাবেন, মিথ্যা কথা না বলিলে সংসার চালাইতে পারা যায় না,—ইহা সত্য নহে। তাঁহারা কোন একটি দ্রব্য কেহ চাহিতে আসিলে অম্লান বদনে বলেন, 'নাই' তাঁহারা ভাবেন, এরূপ মিথ্যা কথা বলা বড় বুদ্ধির কর্ম্ম—ইহা না বলিলে গৃহ সংসার চলে না। আমাদের মতে এরূপ স্থলে মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয় না।

"আমার অধিক নাই" বলিলেই হয়। মিথ্যা কথা কহিয়া পাপ করার প্রয়োজন কি? প্রতারণাও অনেকে করিয়া থাকেন, প্রতারণা বড় পাপ। যদি কাহারও অবস্থা ভাল হয়, তবে তাঁহার অন্যকে সাহায্য করিতেই হয়। সামান্য দুই পয়সার দ্রব্যের জন্য একটা মিথ্যা কথা বলা কত দূর অন্যায়, তাহা যাঁহার বুদ্ধি আছে, তিনিই বুঝিতে পারেন।

দরিদ্রকে দান করা পুণ্যের কর্ম্ম তাহাতে যথেষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়। অনেক গৃহের রমণীরা ভিখারী দেখিলে কপাট বন্ধ করেন। পূর্ব্ব কালে ভিখারীকে ভিক্ষা না দেওয়া পাপের মধ্যে গণ্য হইত, এক্ষণে সভ্য রমণীরা ওরূপ বিবেচনা করা কুসংস্কারের কার্য্য বোধ করেন। এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেও ইঁহাদের কষ্ট বোধ হয়;—আহ্লাদের বিষয় এরূপ রমণীর সংখ্যা এখনও বেশী হয় নাই। অনেকে ভাবেন সকল প্রকার ভিখারীই ভিক্ষা পাইবার উপযুক্ত নহে; আমরা বলি, এক মুষ্টি চাউল দিবে তার আর অত বিবেচনা কেন? কেবল ভিক্ষুক বলিয়া নহে, পাড়া-প্রতিবেশীর অভাব হইলেও, সে অভাব যথাসাধ্য পূরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

নিজের অবস্থায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত, যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তিনি সদা সুখী। একখানি বস্ত্র পাইয়া বা একটি বাক্স্ পাইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে; তাহা হইলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া অধিক ধন দিবেন। যিনি অল্পে তুষ্ট হন না, সহস্র দ্রব্য পাইলেও তাঁহার মন সন্তোষ লাভ করে না—সুখও তিনি কিছুতেই প্রাপ্ত হন না। তাঁহার জীবন চিরকাল

সুখ প্রাপ্তির আশায় অতিবাহিত হয়, কখন সুখে অতিবাহিত হয় না।

অন্যের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই। লোভের বশীভূত হওয়া পাপ। জয়কালীর একখানি এক শত টাকা মূল্যের বেনারসী সাটী দেখিয়া আপনার লোভ হইল, আপনি ভাবিলেন, আহা! আমার যদি একখানি ঐরূপ সাটী থাকিত—এরূপ মনে হওয়া অন্যায়। আপনার যাহা আছে, তাহাতেই আপনি তুষ্ট থাকিবেন। তাঁহাকে ঈশ্বর দিয়াছেন, তিনি পাইয়াছেন, আপনাকে দেন নাই, আপনি পান নাই। সুতরাং তাঁহার বস্ত্র দেখিয়া লোভ যুক্ত হওয়া ধর্ম্মানুমোদিত নহে।

উচ্চ পদস্থা হইলে অহঙ্কার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যিনি যত উচ্চ পদস্থা, তিনি তত নম্র হইবেন। আপনি মুন্সেফের পত্নী বলিয়া এক জন কৃষকের পত্নীকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। কেন না ঈশ্বরের নিকট আপনি ও তিনি দুই সমান। তবে অপনার অবজ্ঞা করিবার কি ক্ষমতা আছে? ধন মান ক্ষণস্থায়ী, আজি আছে কালি নাই, ইহাতে স্ফীত হওয়া কিছু নহে। যাঁহাদের বুদ্ধি অতি কম, তাঁহারাই ধনমদে গর্ব্বিতা হয়েন।

লোককে সর্ব্বদা মিষ্ট বচন বলিবেন; কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করিতেও যে সময় লাগে, মিষ্ট বচন প্রয়োগ করিতেও সেই সময় লাগে; তবে মধুর বচনে লোককে প্রীতি করিবার চেষ্টা না করিবেন কেন? যাঁহার বচন মিষ্ট নহে, তাঁহার সহস্র গুণ থাকিলেও সে গুণ কেহ

দেখেন না। আমাদিগের বিবেচনায় মনুষ্যের কর্কশ বচন প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন অতি অল্প হয়। যত অধিক সময় মিষ্ট বাক্য বলিতে পারা যায়, ততই প্রশংসার কথা।

অন্যের প্রশংসায় স্ফীত হইতে নাই; অনেক সময়েই অনেকে তৈল লবণ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই পরক্ষণে নিন্দা করেন; এরূপ প্রশংসা বা নিন্দায় বিচলিত হওয়া অনুচিত। যিনি কখন প্রশংসায় স্ফীতা না হন, তিনি সাধ্বী; তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মালোচনার যাহা উদ্দেশ্য তাহা তাঁহার সাধিত হইয়াছে।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করা একটি প্রধান ধর্ম্ম। আপনার যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আপনার অন্তরের সহিত পালন করা উচিত, না করিলে অবশ্যই আপনার পাপ হইবে। অতএব যে কোন কার্য্যের ভার আপনার উপর প্রদত্ত হইবে, আপনি তাহা আপনার সাধ্যমত সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা যাহা বলিলাম তাহার সার এই,—সদা সত্য কথা বলা উচিত, দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা বিধেয়, ইন্দ্রিয়গুলি দমন করা আবশ্যক। অহঙ্কার যেন শরীরে না থাকে; মিষ্ট-ভাষিণী হইতে যত্ন করিতে হইবে। লোকের প্রশংসায় স্ফীতা না হওয়াই ভাল, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করা একান্ত উচিত;—এই মত কার্য্য করিতে পারিলেই আমাদের মহি-

লারা ধর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিবেন। পরমেশ্বরের নাম যে সর্ব্বদা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিলাম না; ইহা সকলেই জানেন। এই মত কার্য্য করিয়া কোন মত বিশেষ (যথা ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়) অবলম্বন না করিলেও আমরা ক্ষতি বৃদ্ধি দেখি না।

বঙ্গমহিলার অলঙ্কারপ্রিয়তা।

পূর্ব্বে এরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, স্ত্রীলোকের স্বামী অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই, এক্ষণে দেখা যাই-তেছে উহা ভ্রম-মূলক। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু; যে স্বামী স্ত্রীকে স্বর্ণ-মণ্ডিত করিতে না পারেন, তাঁহার গৃহে কিছু মাত্র আদর থাকে না। যে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার না থাকে, তাঁহার স্ত্রী-মহলে বড় অনাদর হইয়া থাকে; কিন্তু সকল স্ত্রীলোকেই যে অলঙ্কারের জন্য লালায়িত হয়েন, এরূপ নহে, যাঁহারা লালায়িত তাঁহাদিগের কথাই লিখিলাম, তাঁহাদের কথা পাঠ করিয়া অন্যান্য সকলে সাবধান হইবেন, ইহাই আমাদের অভিলাষ।

অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? শারীরিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করা। আমরা স্বীকার করি, অলঙ্কার পরিলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়; অতি কুৎসিতাকেও সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা কৃত্রিম রূপ। আর আমাদের দেশে কেবল রূপ বৃদ্ধির জন্যই কি অলঙ্কারের প্রয়োজন? বোধ হয় নহে; কেন না, তাহাহইলে আবশ্যকীয় কয়েকখানি অলঙ্কার পাইলেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। এবং পেটরা বাক্‌স সাজা-ইবার জন্য রাশি রাশি টাকা দিয়া এত অলঙ্কার ক্রয় করা হইত না। আমাদের মতে কেবল লোক দেখাইবার জন্য এক এক প্রকার দ্রব্য চারি পাঁচ খান করিয়া রাখা হয়। অল-

ঙ্কার বঙ্গাঙ্গনাদিগের অতিশয় অহঙ্কার বৃদ্ধি করে; যাঁহার ভাগ্য বলে বাউটি শুট অলঙ্কার আছে, তিনি অহঙ্কারে কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার পদ মৃত্তিকায় পতিত হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে অলঙ্কার স্ত্রীলোক-দিগের সম্পত্তি; অলঙ্কার থাকিলে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে কষ্ট পাইতে হয় না। যাঁহারা ইহা মনে করিয়া স্ত্রীকে স্তূপাকার অলঙ্কার গড়াইয়া দেন, তাঁহারা যে খুব বুদ্ধিমান এরূপ বোধ হয় না। মনে করুন এক ব্যক্তি স্বীয় সহ-ধর্ম্মিণীকে পাঁচ শত টাকা দিয়া এক জোড়া ইয়ারিং ক্রয় করিয়া দিলেন, পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে যদি তাঁহার পত্নী উক্ত ইয়ারিং বিক্রয় করিতে যান, তাহা হইলে পাঁচ শত টাকাই কি প্রাপ্ত হইবেন? কখন নহে; বড় জোর তিন শত। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার ভূমি ক্রয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে উক্ত টাকা উঠিয়া যাইত; এবং তাঁহার পত্নী সুখে জীবন কাটাইতে পারিতেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, অলঙ্কারকে বিষয় মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ভ্রম মাত্র। কিন্তু কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, এ ভ্রম কেহই বুঝিতে পারেন না। অথবা বুঝিয়া ও বুঝেন না।

আমরা বলিয়াছি, অলঙ্কার শরীরের শোভা বৃদ্ধি করে,—সে কেবল নিমন্ত্রণ খাইবার সময়। অন্য সময়ে প্রায় বাক্স বন্ধ থাকিয়া অধিকারিণীর মনকে শান্ত রাখে। আমরা বিনয়ে বলি, এক এক খানি বৃহৎ প্রস্তর বাক্স মধ্যে বন্ধ করিয়া অলঙ্কার আছে মনে করিলে ভাল হয়। তাহাহইলে

অনেক পুরুষ বাঁচিয়া যান। কিন্তু তাহা হইলে গোলাপী, বিরজা, শ্যামার নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করা কই হইল? তবেই কেবল গর্ব্ব প্রকাশ ও লোক দেখাইবার নিমিত্ত যে অলঙ্কারের প্রয়োজন, ইহা নিশ্চয়। এরূপ অনিষ্টকারী বস্তুর যত ব্যবহার কম হয়, ততই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের দেশে অলঙ্কারের যে কি প্রকার আদর এবং আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ যে কত দূর নীচ হইয়াছে, তাহা বক্ষ্যমাণ যথার্থ ঘটনা দ্বারা পাঠিকাগণ অবগত হইবেন।

একদা আমাদের কোন এক সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ব্যক্তির বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; তন্মধ্যে একটি মহিলার অলঙ্কার ছিল না। অতি দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার এই গুরুতর অপরাধে তাঁহার সহিত কেহ ভালরূপ কথা কহে নাই এবং যে স্থানে স্ত্রীলোকদিগের গল্পের সভা হইয়াছিল, তিনি ঐ স্থানে যাইতে পান নাই। এই খেদে তিনি যতক্ষণ ঐ ক্রিয়া-বাটীতে ছিলেন, কেবল রোদন করিয়াছিলেন। গৃহ-স্বামিণীরও এমন সাহস হয় নাই, যে তিনি উঁহাকে সভাতে বসান। স্ত্রী-শিক্ষার কি এই ফল? বলিতে কি, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব যে এরূপ কোমলতা-হীন ও অহঙ্কারপূর্ণ হইয়াছে তাহা এই ঘটনার পূর্ব্বে জানিতাম না। আর এক রহস্যের কথা বলি। উক্ত বিবাহ-বাটীর একটি আগন্তুক স্ত্রীলোক অপর এক জনের নিকট হইতে একখানি অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়াছিলেন; তাঁহার সেই সঙ্গিনী

নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে সেই অলঙ্কার খানি চাহিলেন; তখন তিনি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বঙ্গ-মহিলাদিগের মানসিক বৃত্তিনিচয় অত্যন্ত নীচ হইয়া পড়িতেছে, এবং স্ত্রী-শিক্ষার কোন বিশেষ ফল হয় নাই।

আমরা বঙ্গ-মহিলাদিগকে সানুনয়ে বলিতেছি যে, তাঁহারা অলঙ্কারের প্রতি এত আনুরক্তি দেখাইবেন না। ইহাতে তাঁহাদের গৌরবের বৃদ্ধি না হইয়া দিন দিন হ্রাস হইতেছে। পুরুষদিগকেও বলিতেছি, যাহাতে তাঁহাদের স্ত্রীদিগের অলঙ্কারের প্রতি এত আনুরক্তি না জন্মে, তৎপক্ষে তাঁহারা যেন দৃষ্টি রাখেন। আর আসল কথা যেন মনে থাকে যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন সহজে এবং শীঘ্র স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া যায় এমন আর কিছুতেই নহে। তুমি যদি আট ভরি সোণার তৈয়ারি, ভবানীপুরের কারিকরের গড়ন, চেন ছড়াটি না ঝুলাইয়া থাকিতে না পার, তাহা হইলে, তোমার স্ত্রীর ৩২ ভরির চূড় না হইলে মন উঠিবে কেন? চিরদিন পুত্তলী সাজাইয়াছ, পুত্তলী তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তোমারই মনোরঞ্জন জন্য সাজিয়াছে, এখন আবার নিজে সঙ্ সাজিতে শিখিয়াছ— পুত্তলী তাহার সাজ ছাড়িবে কেন? তাহাতেই বলি, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-প্রিয়তায় সমাজের যত অনিষ্ট হইয়াছে, পুরুষই তাহার মূল—এখন পুরুষ মনে করিলেই স্ত্রীদিগের অলঙ্কারাভিমান কমিতে পারে এবং সমাজ রক্ষা পায়।

বঙ্গমহিলার কলহ ও নিন্দা-প্রিয়তা।

যদি কেহ বিবেচনা করেন, স্ত্রীলোকের কলহ ও নিন্দা-প্রিয়তা বঙ্গ দেশ হইতে একেবারে দূর হইয়াছে, তবে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহা স্বীকার করি যে, যে সকল মহিলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সাধারণত কলহ, নিন্দা প্রভৃতি হইতে দূরে থাকেন। কিন্তু নিন্দা ও কলহপ্রিয় স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা এক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে এত অধিক যে, তাঁহাদিগের মধ্যে শান্তি-প্রিয় রমণীদিগকে রাখিলে যৎসামান্য বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বের কলহে আর বর্ত্তমান সময়ের কলহে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কলহ হইত, তাহার শব্দে চতুষ্পার্শ্বের লোক সশঙ্কিত হইত,—এক্ষণে সেরূপ কলহ ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় হয় না। কিন্তু গুণ গুণ করিয়া কলহ হওয়া, কলহ-সূত্রে ভাত না খাওয়া ও শয্যা-বলম্বন করা—প্রতি নিয়তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বরং উভয় পক্ষে ক্ষণকাল চীৎকার করিয়া ক্ষান্ত হইত ও অনতি-বিলম্বে পুনরায় উভয়ের মিলন হইত; এক্ষণে মনের ক্রোধ বহু দিন মনে থাকে এবং একবার কলহ হইলে শীঘ্র মিলন হইবার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না।

কলহের যে সকল কারণ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিংসাই প্রধান। দুই ভ্রাতার মধ্যে যিনি অধিক ধন উপা-র্জ্জন করেন, তাঁহার স্ত্রী—অন্য ভ্রাতা যিনি অল্প উপার্জ্জন

করেন, তাঁহার স্ত্রীর হিংসার পাত্রী, তিনি যাহা বলিবেন তাহাই দোষের কথা হইবে; তিনি হাসিলে সে হাসি অবজ্ঞা-সূচক হইবে। যে কোন প্রকারেই হউক, পাড়ার স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়িবেন না। ইহাতে যদি তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তাহা হইলে অমনি তুমুল কলহ বাধে। অনেক সময় ক্ষমতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করায় কলহের উৎপত্তি হয়। ক্ষমতা দেখাইবার ও তিরস্কার করিবার ইচ্ছা পুরুষদিগের মধ্যেও অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তবে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণে ইহার অযথাব্যবহার করেন, স্বভাবত ক্ষমতা-শালী পুরুষেরা তত করেন না। এই সকল রমণীদিগের তাড়নার দ্বারায় দুর্ব্বল পক্ষেরা কলহে প্রবৃত্ত হয়। আজি ডেপুটি বাবুর স্ত্রী কেরাণী বাবুর স্ত্রীকে বলিলেন "তোর স্বামীর ২৫ টাকা বেতন বৈ ত নয়? আমাদের অমন কত কেরাণী আছে।" কাল উকিল বাবুর ঘরণী মোহরি বাবুর ঘরণীকে বলিলেন, "তোদের দেশের লোকেরা কখন কি ঝাড়ওয়ালা ইয়ারিং দেখেছে, না তোরা কখন দেখেছিস?"—এরূপ সংবাদ আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাইয়া থাকি এবং এই সকল কথা লইয়া যে বিষম কলহ হয়, তাহাও জ্ঞাত আছি।

এক্ষণ পর্য্যন্ত এতদূর কলহ-প্রিয়তা রমণীদিগের মধ্যে প্রবল, যে তাহা শ্রবণে গালে হস্ত দিতে হয়। কোন এক ভদ্র লোকের দুই বিবাহ; দুই বিবাহের যে সুখময় ফল তাহা তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিলেও কতকগুলি

রমণীর তাহাতে মন উঠে নাই। কারণ যদিও উক্ত ভদ্রলোকের বাটীতে সময়ে সময়ে কলহ হইত এবং তাঁহাকে অনেক সময়ে বহির্ব্বাটীতে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত, তথাপি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে কাটাকাটি মারামারি হইতে পায় নাই। উল্লিখিত রমণীরা যাহাতে তাহাই হয় ও বাটীতে কাক চিল বসিতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা অনেক করিয়াছিলেন,—ঝি পাঠাইয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল; নিজেরা পাল্কী করিয়া যাইয়া এক জনকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—আবারও কি বলিতে হইবে, স্ত্রীলোকের কলহ-প্রিয়তা কমে নাই?

অসন্তোষ হইতেও আজি কালি কলহের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে একখানি সামান্য সাড়ী পাইলেই রমণীরা চরিতার্থ হইতেন; এক্ষণে ষোল টাকা জোড়ায়ও মন উঠে না, সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীতে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রার্থনা আর যেন এ প্রকার কলহ না হয়; সুশিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের ভেদ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে আমাদিগের সম্ভ্রম থাকে না, মহিলারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কি?

স্ত্রীলোকের কলহ-প্রিয়তার কথা বলিলাম এক্ষণে নিন্দা-প্রিয়তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। নিন্দা অনেক রমণীর স্বভাব-সিদ্ধ অভ্যাস—কোন মতেই তাঁহারা নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন না। "রামের বৌ খ্যাঁদা" "পঞ্চাননের বৌয়ের কপাল উঁচু" প্রভৃতি নিন্দার এখনও কিছুমাত্র

হ্রাস হয় নাই, শীঘ্র হইবেও না। কোথায় কে কাহাকে কি বলিল, কাহার পিতা কাহাকে তিরস্কার করিলেন, কাহার পুত্র কাহাকে টাকা দিল না, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করা কতকগুলি রমণীর প্রাত্যহিক কার্য্য; ইঁহারা নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা; কোনরূপে ইহাদের দিন যায় না, সুতরাং পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। সহস্র চেষ্টাতেও ইঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারা যায় না। অল্প বেলায় আহার করিলে ইঁহারা বলিবেন বাবু; অধিক বেলায় আহার করিলে বলিবেন চাসা; লোকের সহিত আলাপ করিলে বলিবেন বাচাল; না করিলে বলিবেন অহঙ্কারী। ফলত কোন দিকেই পলাইবার পথ নাই। এমন সকল স্ত্রীলোক লইয়া বাস অত্যন্ত কষ্টকর; এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় সেকেলে! আমাদের ভয় ইঁহাদের সহবাসে থাকিয়া পাছে আমাদের সুশিক্ষিতা মহিলারাও ইঁহাদের মত হইয়া যান। তাঁহারা আপনাদের চতুষ্পার্শ্বে এইরূপ অলস, অকর্ম্মণ্য, কলহ ও নিন্দা-প্রিয় স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পাইবেন, সাবধান যেন তাহাদের সহিত মিত্রতা না হয়।

স্ত্রীলোকের নিন্দা-প্রিয়তা হেতু অনেক সময় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হয়। নিন্দা-প্রিয় রমণীরা অনেকেই মূর্খ অথবা অর্দ্ধ শিক্ষিত, যাহাতে অল্পবয়স্কা রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতে না পারে, এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করেন; তাঁহারা কোন বালিকার হস্তে পুস্তক দেখিলেই মর্ম্মঘাতী বাক্যবাণ হানিয়া বসেন এবং পাড়ায়

প্রত্যেক ব্যক্তির বাটীতে উক্ত দোষ শূন্য বালিকার মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বেড়ান ; ইহাতে অনেক বালিকা বিরক্ত হইয়া পাঠ ত্যাগ করে। এই প্রকার নিন্দা হিংসা-প্রসূত। এমন সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ও তাঁহাদিগের কথা না বলাই শ্রেয়ঃ।

মুখরা বঙ্গমহিলা।

অপ্রিয় ভাষিণীর অপর নাম মুখরা। যে গৃহে একটি মাত্র মুখরা স্ত্রীলোক অবস্থিত করে, তাহা অশান্তির চির নিবাস স্থল হয়। মুখরা স্ত্রীলোকেরা মুখের দোষে নিজেও সুখ পায় না, অন্যকেও সুখ দেয় না। তাহারা বিনা প্রয়োজনে অপ্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়া লোকের মনে কষ্ট দেয়। যাঁহার ভার্য্যা মুখরা, তিনি কখন সুখ প্রাপ্ত হন না। খাইয়া, শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, কিছুতেই সুখ পান না—সকল কার্য্যেই তাঁহাকে বাক্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় শান্তি লাভের আশায় তিনি গৃহে আসিলেন; আসিয়াই দেখিলেন, গৃহিণী অগ্নি-মুখী হইয়াছেন—মুখ দিয়া ঝড় বহিতেছে; দেখিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইল, বুকের ভিতর গুরু গুরু করিতে লাগিল; হস্তের ছাতী হস্তেই থাকিল। হয় ত এক প্রহর কাল গৃহিণীর প্রসন্নতা সম্পাদনে অতিবাহিত হইল—এক বিন্দু জল উদরে পড়িল না।

মুখরা হওয়ার কারণ কি? অতিশয় ক্রোধের বশীভূত হওয়া। যাঁহারা মুখরা, তাঁহাদিগের ক্রোধ অত্যন্ত বেশী; অতি অল্প কারণেই তাঁহারা ক্রোধ-যুক্ত হন, এবং ক্রোধ হইলে তাঁহারা অন্ধ হন,—কি বলা উচিত, কি বলা অনুচিত, কাহার সহিত কি প্রকারে কথা কহা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিয়া ফেলেন।

অল্প বয়স হইতে ক্রোধকে দমন করিতে শিক্ষা না করিলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মুখরা নামে আখ্যাত হইতে হয়। ক্রোধ দমন করা একান্ত কর্ত্তব্য; দমন করিবার উপায়ও আছে। যে সময়ে মনোমধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়, সে সময়ে কোন কথা না কহাই শ্রেয়। ইহা নিশ্চয় যে, ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যাহা কিছু বলা যায়, তাহা ক্রোধশান্তি হইলে পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে হয় এবং আপনার কথা আলোচনা করিয়া আপনারই লজ্জা বোধ হয়। ক্রোধোদয় কালে চুপ করিয়া থাকিলে আর এ প্রকার লজ্জা বোধ করিবার আবশ্যক হয় না। মনে করুন, সিন্ধুকে তেরটি বাটি আছে; আপনার পিশাশ ঠাকুরাণী বলিতেছেন, পনরটা বাটি আছে—কিছুতেই তিনি ভ্রম স্বীকার করিবেন না। সে সময়ে তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া মুখরা নাম গ্রহণ করা ভাল, না চুপ করিয়া থাকিয়া মনের ক্রোধ মনেই লয় করা উচিত? বরং বাক্য ব্যয় না করিয়া সিন্ধুক খুলিয়া তেরটি বাটি গণিয়া দেখাইলে কোন কথাই থাকে না। আমাদিগের অনেক রমণীই ক্রোধাক্রান্ত হইয়া গুরুজনদিগের সহিত তর্ক করিয়া মুখরা নাম প্রাপ্ত হন। যৎকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ক্রোধহীন বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন, তৎকালে ধর্ম্ম-পুত্র কি উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই বোধ হয় জানেন।

অল্প বয়সে সমালোচন করিতে শিক্ষা করিয়া কতকগুলি রমণী মুখরা বলিয়া অন্যের উপহাসের পাত্রী হন। গ্রামে যত জামাই আসিবে, সকলকে বিদ্রূপ করিয়া ও সকলের

মনে কষ্ট দিয়া ইহারা আপনাদিগকে অসাধারণ বুদ্ধিমতী জ্ঞান করেন। দেশের লোকের যত বিবাহ হইবে, সকল বিবাহের দোষ ইঁহারা বাহির করিবেন এবং প্রকারান্তরে বরগণকে তাহা শ্রবণ করাইবেন। মিষ্ট বাক্য কাহাকে বলে ইঁহারা তাহা জানেন না—কখন মিষ্ট বাক্য ইঁহাদের মুখ হইতে বাহির হয় না। ইঁহারা অহঙ্কারে সর্ব্বদা পৃথিবীকে সরার ন্যায় জ্ঞান করেন—হয় ত পিতাকেই দুইটা কর্কশ বাক্য বলেন। কতকগুলি স্ত্রীলোকে আবার ইঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন—সে কেবল ভয়ে, নিজেরা সমালোচনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায়। অনেক নির্ব্বোধ পুরুষেও ইঁহাদিগকে বুদ্ধিমতী বলিয়া ইঁহাদের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দেয়—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাহাদের সংখ্যা কম। এ প্রকার স্ত্রীলোক গৃহের কণ্টক-স্বরূপা—ইঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ।

স্পষ্ট কথা বা যথার্থ কথা বলা, আমরা অন্যায় বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদিগের মতে, যে সময়ে স্পষ্ট কথা বলিলে গুরুজনের অপমান হয় বা কেহ মনে কষ্ট পায়, সে সময়ে চুপ করিয়া থাকাই ভাল; নিজে দুই চারিটি কথা সহ্য করিলে সকলেই প্রায় সন্তুষ্ট হয়, প্রশংসাও করে। যথা সাধ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সত্য বটে, গৃহ সংসারে থাকিতে হইলে এমন সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে কথা না কহিয়া থাকা যায় না, কিন্তু সে সকল সময়ে যত অল্প কথা কহা যায়, ততই উত্তম। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহ্যগুণ অধিক

পরিমাণে থাকা চাই; এই জন্যই লোকে স্ত্রীলোককে পৃথিবীর ন্যায় সহ্যগুণ-শালিনী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত-সুবোধ-জাতি পুরুষের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নারীগণের, পুরুষ অপেক্ষা অনেক সময়ে নির্ব্বোধ শ্রেণীর অর্থাৎ নারীগণের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, সুতরাং স্ত্রীলোকদিগকে অধিক সহ্য করিতেও হয়। তাহা যিনি না পারেন তিনি নিন্দার পাত্রী হন এবং তাঁহার মুখরা নাম রটে। অতি দুঃখের বিষয়, অনেক রমণীর অন্তঃকরণ সরল ও অহঙ্কার-শূন্য হইলেও তাঁহাদিগকে লোকে মুখরা বলে। তাহার অন্য কোন কারণ নাই, একমাত্র কারণ, তাঁহাদের আত্ম-দমনে অক্ষমতা—মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাঁহারা তাহাই প্রকাশ করিয়া ফেলেন।

অতএব সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদিগের প্রকৃতি নম্র হওয়া আবশ্যক। যাহাতে তাঁহারা সকলের নিকট শান্ত, ধীর বলিয়া প্রশংসিত হন, তাহার চেষ্টা তাঁহাদিগের সর্ব্বথা করা কর্ত্তব্য।

সেকালের এবং একালের

বঙ্গ-মহিলা।

যদিও আমরা আধুনিক বঙ্গীয় রমণীদিগের মধ্যে সচরাচর যে সকল দোষ দেখিতে পাই, তাহা দেখাইয়া ও ইঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বকালের রমণীদিগের তুলনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা বলিয়া সেকালের রমণীদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের রমণীদিগের জ্ঞান বুদ্ধির যে কিছু উন্নতি হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। কেবল তাহাই কেন, ইঁহাদিগের জ্ঞানোন্নতির ও পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হইয়া ইঁহারা যে এ বিষয়ে সেকালের রমণীদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছি। এক জন ষষ্টিতমবর্ষীয়া সেকালের রমণী যে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারিতেন না, এক জন অষ্টাদশ বর্ষীয়া নব্য রমণী হয় ত তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারিবেন। সেকালের স্ত্রীলোক অর্থে হস্ত-পদ-বিশিষ্ট পুরুষ-সেবায় নিয়োজিত এক প্রকার জীব বুঝাইত, এক্ষণে কোন্ বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তি এই অর্থ নব্য রমণীদিগের উপর খাটাইতে পারেন? সেকালের রমণীদিগের বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়—রীতিমত রন্ধনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গার্হস্থ্য কার্য্যাদি সম্পাদন

পূর্ব্বক আহার নিদ্রাতেই ইঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইত; বহির্জগতের কোন সংবাদ ইঁহারা পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন না, পুরুষেরাও কোন কথা ইঁহাদিগকে বলিতেন না। এক্ষণে অনেক নব্য রমণী হয় ত পুরুষদিগের অপেক্ষা সংসারের অধিক সংবাদ রাখেন—কোন্ ডাক্তার কোন্ বিষয়ে ভাল, কোন্ ঔষধখানায় কিরূপ ঔষধ পাওয়া যায়—এ সকল বিষয় হয় ত পুরুষ অপেক্ষা ভাল বুঝেন। তাহাতেই বলি, জ্ঞানের বৃদ্ধিতে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, আধুনিক বঙ্গরমণী যে কিঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন, তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা বলিয়া থাকি বটে, সেকেলে পাকা গৃহিণীর মত গৃহিণী এক্ষণে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কালের পাকা গৃহিণীতে আর একালের পাকা গৃহিণীতে অনেক ইতর বিশেষ আছে। আমাদের মতে সেকালের পাকা গৃহিণী হওয়া অপেক্ষা, একালের পাকা গৃহিণী হওয়া অনেক কঠিন। সেকালের গৃহিণীদের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল, সেইগুলি তাঁহারা আজীবন সম্পন্ন করিতেন। কার্য্যগুলিও অতি সামান্য ছিল। এত সামান্য যে, যে সকল কার্য্য করিতে তাঁহাদিগের সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইত, মনে করিলে এক্ষণকার রমণীরা তাহা চারি পাঁচ ঘণ্টায় শেষ করিতে পারেন। উক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি ভিন্ন অপর কোন নূতন-তর কার্য্য গৃহিণীদিগের হস্তে পতিত হইলে, তাহা কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাঁহারা ভাবিয়া অজ্ঞান হইতেন। এক্ষণকার গৃহিণীদিগকে, যেমনই কেন

কার্য্য হউক না, একবার বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা এক প্রকারে তাহা সমাধা করিয়াই থাকেন। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের গৃহ সংসারে অনেক কার্য্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক গুলি কার্য্য প্রায় নূতন ধরণের—নবীনা গৃহিণীদিগকে সে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমরা আজি কালি আয় ব্যয়ের ভার, চাকর চাকরাণীর কার্য্যাদির তত্ত্বাবধারণের ভার, এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শেখানর কতকটা ভার পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোকদিগের উপর দিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারি, পূর্ব্বকালের পুরুষেরা সেরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। আমাদের দেশে এখনও পুরাতন গৃহিণীদিগের সংখ্যা অনেক বেশী; কিন্তু তাঁহাদিগের ও নূতন গৃহিণীদিগের কার্য্যাদি দৃষ্টে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, পুরাতন গৃহিণীদিগের অপেক্ষা নূতন গৃহিণীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অধিকতর কার্য্য-কুশলা হইবেন।

একালের মহিলারা কলহ করিয়া অনেক গৃহের শান্তি ভঙ্গ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা যে একেবারে কলহ-শূন্য ছিলেন, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করিব? সেকালে কি স্ত্রীলোকের কলহ-সূত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ হইত না? সকলেই কি নির্ব্বিবাদে কাল যাপন করিতেন? আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বাপেক্ষা কলহ বিবাদের হ্রাস না হইলেও, বৃদ্ধি পায় নাই। অতএব সুশিক্ষার স্রোত প্রবল বেগে বহিলে বর্ত্তমান সময়ের মহিলাদিগের অন্তঃকরণ হইতে কলহ হিংসারূপ মলা মাটী

অল্পদিন মধ্যে বিধৌত হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ব কালের মহিলরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন না। এক্ষণে রমণীদিগের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছে এবং অনেকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন—শিক্ষিতা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্না, সুচতুরা, বহুতর রমণী আজি কালি বঙ্গীয় যুবার গৃহে শোভা পাইতেছেন। এমন স্থলে সেকালের রমণীদিগের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে বিদ্যার অবমাননা করা হয়। কোন্ প্রাণে তাহা করিব? বিশেষ এত দিন বিদ্যার আলোচনা রমণীদের মধ্যে হওয়াতেও তাঁহাদের স্বভাবের বা অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই বা, কেহ ইহা বিশ্বাস করিবেন কেন?

তবে যে আমরা বর্ত্তমান সময়ের রমণীদিগের অনেক গুলি দোষ প্রদর্শন করিয়া আসিলাম, সে কেবল রমণীদিগের এবং আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহাদিগের দোষ ভাগের আলোচনা করিলাম মাত্র। যাহাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ মেঘ-মুক্ত শশধরের ন্যায় নির্ম্মল, নয়ন-মন তৃপ্তিকর স্নিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক যখনই তাঁহাদের গুণাগুণের আলোচনা করিয়া থাকি, তখনই তাঁহারা যে উন্নতির পথে নীতা হইয়াছেন, তাহা আমাদের মনে জাগরূক থাকে। পুস্তক বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে বঙ্গ-মহিলার মঙ্গল হইবে, আমাদের মনের এই বিশ্বাসই যে, আধুনিক বঙ্গ-মহিলার উন্নতির পরিচয়।

বঙ্গ-মহিলার আত্মোন্নতি।

যে সকল গুণ থাকিলে পুরুষ বা স্ত্রীলোক আত্মোনুতি লাভ করিতে পারে, আমাদের দেশের রমণীদিগের সে সকল নাই বলিলেই চলে। কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে সেই বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারা মনুষ্যের একটি প্রধান গুণ। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের রমণীদিগের মধ্যে অনেকেরই এই গুণ নাই। তাঁহারা কোন কার্য্যে চারি দণ্ড মনঃস্থির করিতে পারেন না। এক খানি পুস্তক এক ঘণ্টা পাঠ করিয়াই তাঁহারা বিরক্ত হন, কোন দ্রব্য দৈবাৎ হারাইয়া গেলে দশ পনর মিনিট উহার অনুসন্ধান করিয়াই তাঁহারা বিরক্ত হইয়া পড়েন। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে না পারিলে উক্ত বিষয়ে বিশেষ রূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, সুতরাং আমাদের দেশের রমণীদের কোন বিষয়ই সম্যক্‌রূপ শিক্ষা করা হয় না। গৃহ-কার্য্যই বলুন অথবা শিল্প-কার্য্যই বলুন, বা পুস্তক পাঠই বলুন—কোন বিষয়েই ইঁহাদের সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না।

প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রমণী-দের মন অতিশয় কৌতূহল বিশিষ্ট কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কখন কোন ভাল বিষয় জানিতে আমাদের দেশের রমণীদের মনে কৌতূহল জন্মে না। শীলেদের নূতন বৌ দেখিতে সুন্দরী কি না, কতগুলি অলঙ্কার তাহার শ্বশুর তাহাকে দিয়াছে, রাত্রে জ্ঞানদার স্বামীর সহিত কি কথোপকথন হইয়াছে—

এ সকল কথা জানিবার নিমিত্ত আমাদের রমণীরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু এই যে বঙ্গ-দেশ মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে—ধর্ম্ম-চর্চ্চা সম্বন্ধে—রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে—সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে—লোকের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে—এত আন্দোলন হইতেছে, কোন বিদ্যাভিমানিনী রমণী কি ইহার কোন খোঁজ লইয়া থাকেন? সাধারণত আমাদের দেশের রমণীদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন নাইয়া খাইয়া ঘুমাইয়া এবং পতিকে দুই চারিটি সন্তান উপঢৌকন দিয়া মরিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় রমণী ভূভারতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেমন এক প্রকার নির্জীব ভাব সর্ব্বদা বিরাজ করে—দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়।

কোন একটি বিষয় লইয়া দুই দণ্ড চিন্তা করা যে আবশ্যক, এ কথা আমাদের রমণীরা প্রায় জানেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে দুই একটি চিন্তার উদ্রেক আমরা কখন কখন দেখিয়া থাকি। এক অন্ন চিন্তা, দ্বিতীয় বস্ত্রাদি বেশ ভূষার চিন্তা। আবশ্যক মত অশন ভূষণ পাইলেই বঙ্গবালা নিশ্চিন্ত। বাস্তবিক বঙ্গবালার ন্যায় চিন্তাশূন্য জীব জগতে আর আছে কি না, তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে, এইরূপ চিন্তাশূন্য বলিয়াই ইঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা। যে কখন আপনার অবস্থার কথা চিন্তা করে না, সে কখন আপনার অবস্থা উন্নত কি অবনত তাহা জানিতে পারে না—কাজেই তাহার অবস্থার কখন পরিবর্ত্তন হয় না। সেই জন্য বোধ হয় একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের রমণীদের অবস্থা যেরূপ ছিল এখনও যেন সেই রূপই রহিয়াছে।

নিজের চেষ্টায় যে নিজের উন্নতি হইতে পারে এ ধারণা বঙ্গমহিলাদের মনে হয় না। বালিকা কাল হইতে অন্যের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকলের কিছুমাত্র বিকাশ হয় না। সাধারণত আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস যে, নির্ব্বোধ হওয়া বুঝি তাঁহাদের একটি গুণ, যে কার্য্যে একটু বুদ্ধির প্রয়োজন এমন কোন কার্য্য তাঁহাদিগকে করিতে দিলে তাঁহারা অম্লান বদনে বলিবেন, "মেয়ে মানুষে কি এসব কাজ করিতে পারে?" এমন কি একটা কথা বুঝিতে যদি একটু চিন্তার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া বলিয়া বসিবেন—"সব কথা কি মেয়ে মানুষে বুঝিতে পারে?" এইরূপ যে কোন সময়ে বুদ্ধি পরিচালনার প্রয়োজন হয়, চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সময়েই আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা গা ঢালিয়া দেন—ইহাতে তাঁহাদেরও ক্ষতি আমাদেরও ক্ষতি।

পরমেশ্বর পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে অল্প বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন—ইহা সম্ভব নহে, বিশেষ তিনি যে বিলাতের স্ত্রীলোকদিগকে আমাদের দেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে কি কারণে আমাদের দেশের পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা নির্ব্বোধ হয়? কি কারণে তাঁহাদিগকে বিলাতের রমণীগণের নিকটেও পরাস্ত মানিতে হয়? ইহার উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। রামদুলাল কর্ম্মকার ও রামহরি বন্দ্যো-

পাধ্যায় উভয়ের দুই খানি খাঁড়া আছে। রামহরি বন্দ্যোপাধ্যায় কখন খাঁড়ার ব্যবহার করেন না; তাঁহার খাড়া খানিতে মরিচা ধরিয়াছে, রামদুলাল সর্ব্বদা পাঁঠা কাটিয়া বেড়ায়, রীতিমত খাঁড়াখানিকে যত্ন করে, উহাকে মাজে ঘসে,—তাহার খাঁড়া খানি চক্ চক্ করে। আমাদের দেশের অনেক রমণীর মানসিক বৃত্তিগুলি রামহরির খাঁড়ার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা উহাদের বিশেষ যত্ন করেন না—রীতিমত ব্যবহার করেন না। সুতরাং তাঁহারা আপনাদের দোষেই পুরুষদিগের নিকট ক্ষীণবুদ্ধি হীনজ্ঞান বলিয়া উপহাসের পাত্রী হন।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, পুরুষদিগের সহিত না মিশিলে, পুরুষদের সহিত কথোপকথন না হইলে স্ত্রীলোকদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার যো নাই, তাহাতেই বা হয় কৈ? পিতা, ভ্রাতা, জ্যেঠা, খুড়া, স্বামী, দেবর, শ্বশুর প্রভৃতি কি পুরুষ নহেন? ইঁহাদের নিকট কি নানা বিষয়ের নানা প্রকার কথা আমাদের মহিলারা শুনিতে পান না? কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি হয়—এ বিশ্বাস আমাদের নাই।

ফলত নিজে চেষ্টা না করিলে কিছুতেই নিজের উন্নতি হয় না। আমরা এমন অনেক রমণী দেখিয়াছি, যাঁহাদের বেশ বুদ্ধি আছে; কোন একটা কঠিন বিষয় বুঝাইয়া দিলে অল্পক্ষণেই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন, কিন্তু বুঝিয়া আর মনে রাখিতে চেষ্টা করেন না। কিছু দিন অন্যে যে সকল বিষয় বুঝাইয়া দেয় তাহা বুঝিয়া স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়, স্মরণ করিয়া রাখিতে রাখিতে শেষে নিজেরই এ প্রকার

ক্ষমতা জন্মে যে, কি গৃহ সংসার সম্বন্ধে, কি বিদ্যা সম্বন্ধে, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কোন প্রকার আলোচনা হউক না, তাহা আপনা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের রমণীদের মধ্যে যে তিনটী গুণের অভাব আমরা দেখাইয়াছি, সেই গুণ তিনটি তাঁহাদের না থাকিলে কখন তাঁহারা আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অনুসন্ধিৎসু হইয়া নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা না করিলে তাঁহাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও মন প্রশস্ত হইবে না। আর তাহা না হইলে কি লেখা পড়ার উন্নতি, কি গৃহ কর্ম্মের উন্নতি কোন প্রকার উন্নতিই তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইবে না. তাঁহাদের অবস্থা এখনও যেরূপ রহিয়াছে যুগ যুগান্তেও তেমনি থাকিয়া যাইবে!

যাহা হউক আমরা দেখিতে চাই যে, বঙ্গ-মহিলারা এখন অপেক্ষা বুদ্ধির পরিচালনা, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি ও বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করিতে যত্নবতী হইয়াছেন। পুরুষে এই কার্য্য করিতে পারেন, স্ত্রীলোকে পারেন না—পুরুষে এই কথাটা বুঝিতে পারেন, স্ত্রীলোকে পারেন না, এ বিশ্বাস তাঁহাদের মনে একেবারেই হওয়া অনুচিত।

আমাদের শেষ নিবেদন।

এই পুস্তকে যত গুলি প্রবন্ধ বঙ্গ-মহিলা সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছি তৎসমুদয় পাঠে বঙ্গ-মহিলারা, বোধ হয়, আমাদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতে পারেন, আমরা ক্রমাগত তাঁহাদিগের দোষই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ভ্রমেও গুণানুবাদ করি নাই, অতএব তাঁহাদিগের নিন্দা করাই আমাদের প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য; ইহা সত্য নহে।

এ সংসারে বন্ধু দুই প্রকারের। বন্ধুর দোষকে দোষ জ্ঞান না করা, বন্ধু যে কোন কার্য্য করেন তাহা উত্তম বিবেচনা করা, বন্ধুর বিন্দুমাত্র গুণ দেখিয়া তাহার শত সহস্র প্রশংসা করা— এক প্রকার বন্ধুর কার্য্য। আবার বন্ধুর বিবিধ গুণ থাকিলেও তাঁহার সামান্য দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা এবং যাহাতে তাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, যাহাতে তিনি সকল গুণের আধার হয়েন, সকলে তাঁহার প্রশংসা করে, এরূপ চেষ্টা করা—আর এক প্রকার বন্ধুর কার্য্য। আমরা বঙ্গমহিলাদিগের শেষোক্ত প্রকারের বন্ধু। আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল দোষ আছে ও থাকিবার সম্ভাবনা, তৎসমুদায় স্পষ্টাক্ষরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; গুণ দেখাইব বলিয়া কোন প্রবন্ধ লিখি নাই; তাহাতেই আমাদিগের লিখিত প্রবন্ধগুলি প্রথম পাঠে কর্কশ বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে এবং আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে নিন্দুক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিব। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, ভরসা করি

তাঁহারা আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হয়েন নাই। অনেক সময় সত্য কথা বলিলে তাহা শ্রুতি-মধুর হয় না, কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে এক শব্দও এই পুস্তকে লিখিত হয় নাই।

আমরা যে প্রকারে কার্য্য করিতে বঙ্গ-মহিলাদিগকে বলিয়াছি, তাহা ভিন্ন যে অন্য প্রকারে সেই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা কদাচ সম্ভব নহে ; তবে আমরা তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সদুপায় বলিয়া দিয়াছি মাত্র। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন—আমরা যে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের বুদ্ধির অভাব বা অপরিণামদর্শিতা দেখাইয়া দিয়াছি, তাহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয় আছে। সে সকল বিষয় তাঁহারাই বিশেষরূপ অবগত আছেন—আমরা তাঁহাদিগকে কেবল পথ দেখাইয়াছি মাত্র, কিন্তু সেই পথে তাঁহারা কখন কি ভাবে গমন করিবেন, তাহা বিবেচনা করিবার ভার তাঁহাদের উপরেই রহিল। এই আমাদের শেষ নিবেদন।

সম্পূর্ণ।